শিশু রাজার দেশ



অগ্নিকুমার আচার্য

শিশু রাজার দেশ

[নাটিকা]

অগ্নিকুমার আচার্য

দি নিউ বুক স্টল
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশনায় ঃ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল
দি নিউ বুক ষ্টল
৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ সাত টাকা মাত্র

ছেপেছেন ঃ
রামপ্রসাদ নাগ
সারদা প্রিন্টার্স
১৪এ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

• উৎসর্গ •

সুযোগ্য নাট্যোৎসাহী
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দেব
চেয়ারম্যান,
ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন
করকমলেষু

• পূর্বভাষ •

অভিনয়ের প্রতি শিশুদের একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। তাদের কল্পনাবিলাসী মন কত বিচিত্র ভূমিকায় যে নিজেদের স্থাপন করে আনন্দলাভ করে তার হদিশ পাওয়া ভার। খুব ছোটবেলায় মা-বাবার ভূমিকা থেকে সুরু করে তেপান্তরের রাজপুত্র, রূপকথার রাক্ষস খোক্কস, পশুপক্ষী দত্যিদানা—সব ভূমিকায় শিশু নিজেকে ভাবে, কল্পনা করে। এই মনস্তাত্ত্বিক কারণেই শিশুমনের বিকাশে অভিনয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

একটা যুগ গেছে যখন শিশু-সাহিত্যিকেরা বিচিত্র স্বাদের শিশু নাটক সৃষ্টি করেছেন। আজকাল বড়োদের নাটক নিয়েই বেশি নাড়াচাড়া, বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা। শিশুদের নাটক নিয়ে ভাবনার অবকাশ যেন ক্রমেই সংকুচিত। লক্ষ্য করে দেখেছি, ইস্কুলে পাড়াতে অভিনয় করার মত নাটক শিশুরা আর খুঁজে পায় না। শিশুদের এই অভাব দূর করতে আমার লেখা শিশু নাটিকার কয়েকটিকে সংযোজিত করে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছি। এই নাটিকার সবগুলোই আগরতলা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত শিশু-ত্রৈমাসিকী 'কাকলী'-তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটা আবার আগরতলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

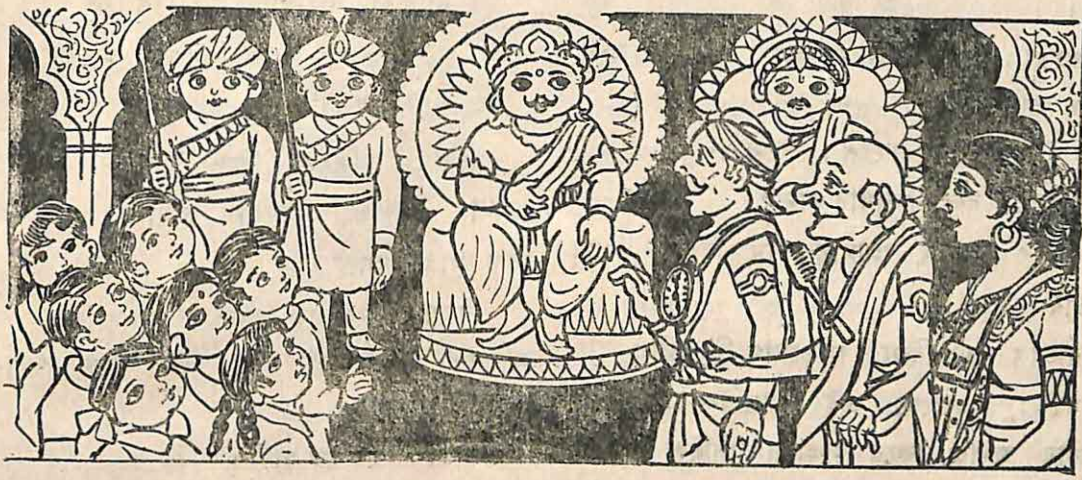
এই একাঙ্কিকাগুলো শিশুদের নাটকের অভাব যদি কিছুমাত্র পূরণ করে তবেই শ্রম সার্থক হবে।

আগরতলা
জানুয়ারী, ১৯৮২

অগ্নিকুমার আচার্য

● যে যে নাটিকা এ বইয়ে আছে ●

শিশু রাজার দেশ



: চরিত্র :

শিশু রাজা ॥ মন্ত্রী ॥ প্রহরী ॥ বিলম্ব উত্থান ॥ ঘড়িবাবু ॥ অপরিষ্কৃতা চৌধুরী ॥ টুথব্রাশ খুড়ো ॥ সাবানদিদি ॥ নরুণবালা ॥ রুগণা ॥ রাজবৈদ্য ॥ ফাঁকিবালা ॥ সঙ্গিনী ॥ আদায়চাঁদ ॥ কর্মচারী ॥ খদ্দেরগণ ॥ বালকভিক্ষুক প্রভৃতি।

[শিশু রাজার রাজসভা। শিশুরাজা সিংহাসনে বসে আছেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সকলেই শিশু]

(তুরীভেরী বাদ্য বেজে ওঠল)

সভাসদদের জয়ধ্বনি—জয় শিশুজনপালক শিশু-অরিনাশক, শিশু শুভদায়ক মহারাজ শৈশবরাজের জয়।

(বাদ্য বেজে ওঠল)

শিশু মহারাজ : মন্ত্রী, সভার কাজ সুরু হোক।

মন্ত্রী : হ্যাঁ মহারাজ। সঙ্গীত-সর্বজ্ঞ, রাজ্যের জাতীয় সঙ্গীত সুরু করুন।

[সঙ্গীত সর্বজ্ঞরা গান সুরু করলেন]

[গান] শিশু রাজার দেশ।
শিশু রাজা শিশু প্রজা
সাবাস সাবাস বেশ ॥
তাধিন তাধিন ধিনা
হাসাহাসি নাচানাচি খেলাধুলা বিনা
আমরা বাঁচি না ॥

রাজা : মন্ত্রী, আজকের কর্মসূচী ঘোষণা করুন—

মন্ত্রী : মহারাজ, রাজ্যের সংবিধান ও আইন অমান্যকারী বন্দীদের বিচার সভায় আনা হয়েছে। আপনার অনুমতি হলে দোষীদের আপনার সম্মুখে হাজির করি—

রাজা : হ্যাঁ, হাজির করুন।

মন্ত্রী : প্রহরী, এক এক করে বন্দীদের হাজির করো।

প্রহরী : যথা আজ্ঞা মহারাজ। এই ১নং বন্দী হাজির হো—

[১নং বন্দীর-প্রবেশ। বয়স ১০]

রাজা : বন্দী, তোমার নাম ?

বন্দী : আজ্ঞে, আমার নাম বিলম্ব উত্থান ভট্টাচার্য।

রাজা : এর বিরুদ্ধে অভিযোগ কি মন্ত্রী ?

মন্ত্রী : মহারাজ, এই নাগরিক, রাজ্যের সংবিধান অমান্য করে সকালে অধিক বেলায়, সূর্যোদয়ের অনেক পরে রোজ ঘুম থেকে ওঠে। রাজ্যের গুপ্তচরেরা সে কথা জানতে পেরে গতকাল ওকে বন্দী করে এনেছে।

রাজা : রাজ্যের সংবিধানে কি লেখা আছে পাঠ করে শোনান—

মন্ত্রী : মহারাজ সংবিধানে আছে—

শিশুরাজ্যের যত প্রজা অতি প্রাতঃকালে,
শয্যাত্যাগ করতে হবে ঘুম দূরে ফেলে।
ভোরে ওঠে যেই শিশু স্বাস্থ্য ভাল হয়।
এ আইন অমান্যে শাস্তি জানিহ নিশ্চয়॥

রাজা : এই নাগরিকের অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে কোন সাক্ষী আছে ?

মন্ত্রী : হ্যাঁ মহারাজ। সাক্ষী ঘড়িবাবু—

প্রহরী : সাক্ষী ঘড়িবাবু হাজির হো—

[ঘড়িবাবুর প্রবেশ, গলায় ঘড়ি ঝুলানো]

রাজা : সাক্ষী ঘড়িবাবু, এই নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য ?

ঘড়িবাবু : হ্যাঁ মহারাজ, শুনুন তাহলে—

চলি আমি নির্ভুল টিক্ টিক্ টিক্।
আজিকার অভিযোগ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্॥
ছয় বাজি সাত বাজি, বাবু ঘুমে অচেতন।
আট যবে বাজি বাবু, হন জাগরণ॥

রাজা : অভিযুক্ত বিলম্ব উত্থান ভট্টাচার্য, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত। তোমার কিছু বলরার আছে ?

বিলম্ব : মহারাজ, এই অপরাধের জন্য সম্পূর্ণত আমি দায়ী নই। এর জন্যে প্রধানত দুইজন দায়ী।

রাজা : কে কে দায়ী ?

বিলম্ব : মহারাজ, এর জন্যে প্রথমত দায়ী শীত। আজ কটা দিন যাবৎ শীতবুড়ো তীব্রভাবে আমাকে আক্রমণ করেছে, যার ফলে শয্যাত্যাগে বিলম্ব ঘটে। আর, দ্বিতীয়ত দায়ী নিদ্রা। আমি তাকে ছাড়তে চাইলেও, সে আমাকে ছাড়তে চায় না। সে জন্যেও ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয় মহারাজ।

রাজা : তুমি অন্যের কাঁধে নিজের দোষ চাপিয়ে মুক্তি পেতে চাইছ। এটা খুব অন্যায়। মন্ত্রী, সংবিধানে কি লেখা আছে ?

মন্ত্রী : মহারাজ, সংবিধানে আছে—

হতে পারে, কাজে ভুল, হতে পারে দোষ।
সত্য বল স্বীকার কর, কমে রাজ রোষ॥

রাজা : যাক, ভবিষ্যতে অন্যের কাঁধে দোষ চাপিয়ে নিজে বাঁচবার চেষ্টা করবে না। এটা খুব নিন্দনীয়। তোমাকে আমি এক মাসের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দিলাম—এই এক মাস প্রতিদিন

আমার রাজ্যের ঘড়িবাবুরা ক্রিং ক্রিং শব্দে অতি ভোরে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবে। এতে তোমার প্রত্যুষে নিদ্রাত্যাগ অভ্যাসে পরিণত হবে। তাহলে, শীত আর ঘুম কেউই তোমাকে ভোরে শয্যাত্যাগে বাধা দিতে পারবে না। প্রহরী, একে নিয়ে যাও—

বিলম্ব : যথা আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান]

রাজা : এ যে দেখছি এক বন্দিনী। এর অপরাধ কি মন্ত্রী ?

মন্ত্রী : মহারাজ এই বন্দিনীও অপরাধী। এর নাম অপরিষ্কৃতা চৌধুরী। এর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ—এই বন্দিনী সংবিধানের ধারা অমান্য করে অপরিচ্ছন্ন থাকে। ও ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজে না, রীতিমত স্নান করে না, নখ কাটে না, নোংরা ময়লা জামা কাপড় পরিধান করে। দেখুন মহারাজ, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখুন, ওর সারা শরীর খোস পাঁচড়ায় ভর্তি। নখগুলো আর একটু বড় হলে তাড়কারাক্ষসীর নখের আকার ধারণ করবে।

রাজা : মন্ত্রী, ওকে একটু দূরে সরে দাঁড়াতে বল। হুঁ, এর শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে—

মন্ত্রী : এই সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া।

রাজা : এর বিরুদ্ধে সাক্ষী আছে ?

মন্ত্রী : আছে মহারাজ। প্রথম সাক্ষী টুথব্রাশ খুড়ো—

প্রহরী : সাক্ষী টুথব্রাশ খুড়ো হাজির হো -

[সাক্ষীর প্রবেশ গলায় টুথব্রাশ ঝুলানো]

রাজা : সাক্ষী টুথব্রাশ খুড়ো, এই বন্দিনীর বিষয়ে আপনি কি জানেন ?

টুথব্রাশ : মহারাজ, আমার নাম টুথব্রাশ খুড়ো। এই মেয়েটি আমাকে মোটেই পছন্দ করে না। একদিনও আমাকে হাতে নেয় না। আমি কত বলি, আমাকে দিয়ে রোজ ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজ। দাঁত পরিষ্কার থাকবে, দাঁতের কোন রোগ হবে না। কিন্তু মহারাজ, ও আমাকে পাত্তাই দেয় না।

রাজা : হুঁ, দ্বিতীয় সাক্ষী—

প্রহরী : সাক্ষী সাবানদিদি হাজির হো—

[সাবান দিদির প্রবেশ। গলায় সাবান ঝুলানো]

সাবান : মহারাজ, আমি কতদিন এই মেয়েটিকে বলেছি, আমাকে তোমার শরীরে একটুখানি ঘস। তোমার শরীরের ময়লা কাটবে, তোমার খোস পাঁচড়া সব রোগ দূর হবে। কিন্তু মেয়েটি আমার কথায় আমলই দেয় না। তাই তো এর শরীরে নানা চর্মরোগ এসে ঘাঁটি বেঁধেছে।

রাজা : বুঝলাম আর কোন সাক্ষী আছে ?

মন্ত্রী : আছে মহারাজ, তৃতীয় সাক্ষী নরুণবালা। নরুণবালা হাজির হো—

[নরুণবালার প্রবেশ। গলায় নরুণ ঝুলানো]

নরুণবালা : হ্যাঁ মহারাজ, আমিও এই মেয়েটির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছি। আমি মেয়েটির দু'চোখের বিষ। একদিনও সে আমাকে হাতে নিয়ে দেখেনি। তাইতো ওর হাতের নখগুলো রাক্ষসীর নখের মত। এই নখের ভেতর থাকে নোংরা ময়লা। খাবারের সঙ্গে এসব ময়লা ওর পেটে যায়। আর সেজন্যেই সে নানা পেটের রোগে ভোগে।

রাজা : অপরিষ্কৃতা চৌধুরী, তোমার অপরাধ গুরুতর। তুমি আমার রাজ্যের সংবিধান অমান্য

করে দাঁত পরিষ্কার কর না, নখ কাট না স্নান কর না, গায়ে সাবান মাখ না, নোংরা জামা কাপড় পরিধান কর। এজন্যে তোমার কঠোর সাজা হবে।

অপরিষ্কৃতা : মহারাজ আমাকে প্রথমবারের মত মার্জনা করুন। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আর কখনও আমি নোংরা থাকব না। রোজ ভোরে উঠে দাঁত মাজব। প্রতি সপ্তাহে নখ কাটব। রোজ স্নান করব, মাঝে মাঝে গায়ে সাবান মাখব- সব সময় পরিচ্ছন্ন থাকব।

রাজা : তুমি সত্য কথা বলেছ এবং নিজের দোষ স্বীকার করেছ বলে, তোমাকে আমি এবারকার মত মার্জনা করলাম। তবে ভবিষ্যতে যদি কোন দিন তোমাকে অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন দেখা যায়, তা হলে তোমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে—একথা জানিয়ে রাখলাম।

অপরিষ্কৃতা : যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান]

রাজা : মন্ত্রী আর কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে ?

[রুগ্ণার প্রবেশ। খুব রোগা চেহারা। ১২ বছরের একটি মেয়ে।]

রুগ্ণা : মহারাজের কাছে আমার একটি নালিশ আছে।

রাজা : কে তুমি ? কি তোমার নালিশ বল।

রুগ্ণা : মহারাজ, আমার নাম রুগ্ণা রায়। আমি আপনার রাজ্যেরই এক অসুখী প্রজা। সারা বছর এ রোগ, সে রোগ নানা রোগে ভুগি। গতকাল আমি রাজবৈদ্যের কাছে ওষুধের জন্য গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে ওষুধ দেন নি। আমি রাজবৈদ্যের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থী মহারাজ।

রাজা : রাজবৈদ্য—

[বৃদ্ধ রাজবৈদ্যের প্রবেশ]

রাজবৈদ্য : মহারাজ—

রাজা : রুগ্ণা রায়ের অভিযোগ সত্য ?

রাজবৈদ্য : হ্যাঁ মহারাজ, আমি মেয়েটিকে ওষুধ দিতে অস্বীকার করেছি।

রাজা : আপনার অস্বীকার করার কারণ ?

রাজবৈদ্য : মহারাজ আমি মেয়েটিকে পরীক্ষা করে দেখেছি, কোন ওষুধে মেয়েটির রোগ সারবে না, কারণ, স্বাস্থ্যবিধি না মানার জন্যে এবং পুষ্টিকর খাদ্য না খাওয়ার জন্যে মেয়েটি দীর্ঘকাল রোগে ভুগছে। তাই এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ওকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। কিছু পুষ্টিকর খাদ্যও ওকে খেতে হবে।

মন্ত্রী : মহারাজ, রাজবৈদ্য ঠিকই বলেছেন, আমাদের সংবিধানে আছে, এ রাজ্যের প্রতি নাগরিককে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। যেমন, স্নান, আহার ইত্যাদি রোজ সময়মত করা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, রোজ বিকেলে খেলাধূলো করা, ব্যায়াম করা, খোলা বাতাসে বেড়ানো এসব কাজ করতে হবে। আর কিছু পুষ্টিকর খাদ্যও প্রত্যেককে খেতে হবে।

রুগ্ণা : মহারাজ আমরা গরীব, পুষ্টিকর খাদ্য কিনে খাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

রাজবৈদ্য : মহারাজ। এই মেয়েটির কথা ঠিক নয়। ওরা রান্নার নিয়ম জানে না, তাই খাদ্যের

গুণ নষ্ট করে ফেলে। ভাতের ফেন ফেলে দেয়, খোসা ছাড়াতে গিয়ে সব্‌জীর সারবস্তু নষ্ট করে ফেলে। তা ছাড়া ওর বড় অপরাধ, সে সবুজ শাকপাতা খায় না। অথচ সবুজ শাকপাতা যেমন, মূলোপাতা, পুঁইশাক, নটে, পুদিনা, সরষে, পালং এসবের মধ্যে প্রচুর ভিটামিন আছে। রোজ এগুলো কিছু পরিমাণ খেলে নানা রোগের হাত থেকে ও মুক্তি পেতে পারে।

রাজা ঃ রুগ্‌ণা, তুমি নিজে অপরাধিনী হয়ে, রাজবৈদ্যের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছো। এর জন্যে তোমাকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব। কি শাস্তি দেওয়া যায় মন্ত্রী ?

মন্ত্রী ঃ এতদিন ধরে সে যেহেতু খাদ্য-গুণ নষ্ট করে এসেছে, সেজন্যে ওকে এক মাস শুধু ভাতের ফেন, সব্‌জীর খোসা আর নানা শাকপাতা খেয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হোক।

রাজবৈদ্য ঃ আমার একটি নিবেদন আছে মহারাজ।

রাজা ঃ কি নিবেদন বলুন রাজবৈদ্য ?

রাজবৈদ্য ঃ মহারাজ, এরূপ শাস্তি দিলে, ওর শরীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। কারণ আমাদের দরকার সুসম খাদ্য। মন্ত্রীমশাই যে শাস্তির কথা বলেছেন, তাতে সুসম খাদ্য পাবে না মেয়েটি। তাই ওকে সুসম খাদ্য খাবার আদেশ দিন।

রাজা ঃ শোন রুগ্‌ণা রায়। তোমার রোগের কারণ তো এবার জানতে পারলে। তাই আজ থেকে তোমাকে স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত মেনে চলতে হবে এবং সুসম খাদ্য খেতে হবে। যদি আর কোন দিন তোমার এসব নিয়ম অমান্য করার খবর পাই, তবে আমার রাজ্য থেকে তোমাকে নির্বাসিত করব। বুঝলে ? মন্ত্রী আজকের মত সভা এখানেই শেষ হল।

সকলে ঃ জয় মহারাজ শিশুরাজের জয়।

রাজা ঃ মন্ত্রী, শোন, আজ রাতে আমরা ছদ্মবেশে ভ্রমণে বের হবো। কারা কারা সংবিধান অমান্য করছে তা হাতেনাতে ধরব।

মন্ত্রী ঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ।

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[রাজপথ। পথের পাশের এক বাড়িতে দুই মেয়ে লুডু খেলছে।]

ফাঁকিবালা ঃ এক ছক্কা, দুই ছক্কা, দুই ছক্কা চার—নে, মার এবার—

সঙ্গিনী ঃ মারব ; এই ছক্কা—দূর—কানা—নে মার—

ফাঁকিবালা ঃ কত উঠলে তোর ঘুঁটি কাটা পড়বে রে ? দেখি এক, দুই, তিন, চার, পাঞ্জা একটা পাঞ্জা—পাঞ্জা (জোরে) পাঞ্জা—ঘেচাং, সঙ্গিনী তোমার ঘুঁটি ঘরে নিয়ে যাও—

সঙ্গিনী ঃ খেয়ে ফেললি আমার ঘুঁটিটা ! দাঁড়া, তোর এই ঘুঁটিটাকেও সাবাড় করছি। একটি চার—চার—চার—তিন—

সঙ্গিনী ঃ দুস্‌ হলো না। খেতে পারলাম না তোকে।

[আড়ালে দাঁড়িয়ে রাজা ও মন্ত্রী খেলা দেখছেন। সঙ্গে প্রহরী]

মন্ত্রী ঃ (অস্ফুট কণ্ঠে), মহারাজ ; ঐ দেখুন দুটো মেয়ে লেখাপড়ার সময়ে দিব্যি লুডু খেলে চলেছে।

রাজা ঃ তাই তো ? পড়ার সময়ে লুডু খেলা ! কি সাহস দেখছ মেয়ে ছুটোর। (জোরে) এই মেয়েরা, বন্ধ কর খেলা — [প্রবেশ]

ফাঁকিবালা ঃ [চমকে ওঠল] সর্বোনাশ, এখন কি করি ?

রাজা ঃ প্রহরী বন্দী কর এই দুই মেয়েকে।

উভয়ে ঃ মহারাজ, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন।

রাজা ঃ তোমাদের নাম কি ?

ফাঁকিবালা ঃ আমার নাম ফাঁকিবালা, ও আমার সঙ্গিনী। আমাদের মার্জনা করুন রাজা।

রাজা ঃ মার্জনা ! তোমরা পড়ার সময় খেলছ, আর তোমাদের মার্জনা করব ? মন্ত্রী, সংবিধানে কি লেখা আছে ?

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, সংবিধানে আছে—

পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা।
পড়ার সময় খেল যদি পড়ায় অবহেলা।
করলে পড়ায় অবহেলা পরীক্ষাতে ফেল।
বছর শেষে কান্নাকাটি বুকে বাজে শেল !!

রাজা ঃ প্রহরী, রাজ্যের সংবিধান অনুসারে ফাঁকিবালা আর তার সঙ্গিনী শাস্তির যোগ্য। ওদের বন্দী করে নিয়ে চল, কাল প্রকাশ্য রাজসভায় ওদের বিচার হবে।

ফাঁকিবালা ও সঙ্গিনী ঃ মহারাজ আমরা কাল থেকে পড়ার সময় পড়ব, খেলার সময়ে খেলব। বছরের শেষে পরীক্ষায় ভাল করে পাশ করব, এবারকার মত আমাদের ক্ষমা করুন।

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, ওরা যখন এত কাকুতি মিনতি করছে, তখন ওদের কাছ থেকে একটা মুচুলেকা নিয়ে ওদের ছেড়ে দিন। যদি এ বছর পরীক্ষায় ওরা ফেল করে, তবে না হয় ওদের শাস্তি বিধান করা যাবে।

ফাঁকিবালা ঃ মহারাজ, আমরা শপথ করছি, সারা বছর মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করব এবং পরীক্ষাতে আমরা পাশ করবই।

রাজা ঃ যাও, এবার ছাড়লাম কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ করলে আর রক্ষে নেই মনে থাকে যেন। মন্ত্রী, চল ওদিকটাতে যাই—

মন্ত্রী ঃ চলুন মহারাজ চলুন—

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[এক চায়ের দোকান। দোকানে এক শিশু-শ্রমিক খদ্দেরদের চা দিচ্ছে। মালিক বাক্স নিয়ে সামনে বসে হুকুম দিয়ে যাচ্ছে। মালিকের নাম আদায়চাঁদ। বয়স ৪০]

(শিশু কর্মচারীর গান)

খেতে হলে গরম চা, আসুন দাদা আসুন।
গরম চায়ে চুমুক দিয়ে স্বর্গের মজা লুটুন ॥

আদায়চাঁদ ঃ এই দেখছিস নে, খদ্দের বসে আছে। তাড়াতাড়ি ওদের চা দে, খাবার দে—

শিশু কর্মচারী ঃ দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি—একটু সবুর করুন। জলটা ফুটেনি এখনও ভাল করে।

আদায়চাঁদ ঃ জল ফুটেনি ভাল করে ? এতক্ষণ কি করেছিস ? কার পিণ্ডি চটকেছিস ? মারবো এক গাট্টা—পাজী কোথাকার—বেলায় বেলায় থাল থাল রাজভোগ খাচ্ছিস—তোর কি ? [ঝনাৎ করে গ্লাস ভাঙ্গার শব্দ। কর্মচারীর হাত থেকে একটি কাঁচের গ্লাস পড়ে ভেঙে গেল] এই সেরেছে রে ? গ্লাসটা ভেঙ্গে দিলি তো ? আয় হারামজাদা, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। [দু'চার ঘা

বসিয়ে দিয়ে] আজ অব্‌দি কটা গ্লাস ভেঙেছিস? বেরো বেরো দোকান থেকে—ঘাড় ধরে তোকে আজ বের করে দেব—

কর্মচারী : (কেঁদে কেঁদে) আমি ইচ্ছে করে ভাঙিনি। আর ভাঙবো না—

আদায়চাঁদ : আর ভাঙবো না—বেরো শূয়ার —বেরো দোকান থেকে—

[রাজা, মন্ত্রী ও প্রহরীর হঠাৎ প্রবেশ]

মন্ত্রী : ঐ দেখুন মহারাজ রাজ্যের আইন অমান্য করে শিশু শ্রমিককে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

রাজা : প্রহরী, বন্দী কর এই চায়ের দোকানের মালিককে।

আদায় : মহারাজ, আমি না, আমি না— আপনাকে চিনতে পারিনি মহারাজ—

রাজা : তুমি কি জান না এ রাজ্যের আইন? একটা গ্লাস ভেঙেছে বলে এইটুকুন ছেলেকে এত মারধোর করছো? ওকে ক'ঘণ্টা খাটাও? বেতন কত দাও? চুপ করে আছ যে বড়ো, সত্যি কথা বলো—

আদায় : মহারাজ, ও ভোর থেকে রাত দশটা অবধি কাজ করে। পেট ভরে খেতে দিই, কাপড়-চোপড়ও দিই। গরীব দোকানদার আমি বেতন দিতে পারিনে।

রাজা : পেটপুরে খেতে দাও, বেতন দিতে পার না, আবার খাটাও আঠারো ঘণ্টা। আর একটা গ্লাস ভাঙতে ঘাড় ধরে বের করে দিচ্ছ ওকে। তোমার কি দয়ামায়া বলতে কিছু নেই? প্রাণ বলতে কিছু নেই? পারতে নিজের ছেলেকে এভাবে খাটাতে? এভাবে মারধোর করতে?

আদায় : মহারাজ, অন্যায় হয়ে গেছে ক্ষমা করুন। ভবিষ্যতে আর এরূপ কাজ কখনো করব না।

মন্ত্রী : মহারাজ ওকে বন্দী করুন। কাল প্রকাশ্য রাজসভায় ওর বিচার হবে।

রাজা : প্রহরী, এই ব্যক্তিকে বন্দী করে নিয়ে চল—ওর বিচার হবে।

প্রহরী : চলহে—চল—

রাজা : চল মন্ত্রী, এগিয়ে চল—

মন্ত্রী : চলুন মহারাজ চলুন।

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[রাজপথ। রাজা ও মন্ত্রী হাঁটছেন। এমন সময় এক বালক ভিক্ষুক এসে দাঁড়াল]

বালক ভিক্ষুক : দুটো পয়সা দাও বাবা, তিনটে দিন পেটে দানা পড়েনি। দুটো ভিক্ষে দাও বাবা!

রাজা : মন্ত্রী, আমার রাজ্যে শিশুভিক্ষুক! এও কি সম্ভব? রাজ্যের আইন কি কেউ মানছে না? এই, তোর কে কে আছে?

ভিক্ষুক : আমার কেউ নেই বাবা, দুটো ভিক্ষে দাও বাবা, তিন দিন পেটে দানা পড়েনি।

রাজা : কেউ নেই? সত্যি করে বল? নইলে এক্ষুনি, প্রহরী—

ভিক্ষুক : ওরে বাপরে, আছে বাবা আছে। আমার বাপ মা আছে।

রাজা : বাপ মা আছে? ওরা কোথায়?

ভিক্ষুক : বাড়ীতে আছে বাবা, বাড়ীতে আছে।

রাজা ঃ তুই ভিক্ষে করতে এসেছিস কেন ?

ভিক্ষুক ঃ আমরা তিন ভাইবোন। বাবা আমাদের তিনজনকে ভিক্ষে করতে পাঠায়। ভিক্ষে করে চাল পয়সা যা পাই তা নিয়ে বাবার হাতে দিই। তাতে আমাদের খাওয়া পরাটা চলে।

রাজা ঃ মন্ত্রী, এই বুঝি তোমরা আমার রাজ্যের আইন সঠিক চলছে কিনা দেখছ। ছিঃ ছিঃ এ আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় মন্ত্রী, আমার রাজ্যে শিশুরা করবে ভিক্ষে, আর বাপ-মা ঘরে বসে বসে খাবে ? এর চাইতে ঘৃণা আর দুঃখের কি হতে পারে মন্ত্রী ! প্রহরী, যাও এক্ষুনি এদের বাপকে বন্দী করে নিয়ে এসো—

প্রহরী ঃ এই, চল, তোর বাড়ী কোন দিকে চল—

[প্রহরী সহ বালকটির প্রস্থান]

রাজা ঃ আজ ভ্রমণে বের হয়ে একী দেখলাম মন্ত্রী। শিশুরাজার রাজ্যে শিশুদের প্রতি মালিকদের, পিতামাতার এ কী অবিচার ? আজ আমার চোখ খুলে গেল মন্ত্রী। শিশুরা এত কষ্ট পাচ্ছে। এত যাতনা পাচ্ছে। আর আমি চোখ বুজে রাজত্ব চালাব ? না না, এ হতে পারে না মন্ত্রী। শিশুদের প্রতি এ অবিচার আমাকে বন্ধ করতেই হবে। বন্ধ করতেই হবে।

[আগরতলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত]

—শেষ—

স্বপ্নপুরী



ঃ চরিত্র ঃ

সন্তু ও মণ্টু ॥ তুই বন্ধু ঃ বয়েস ৮-৯ বছর। সন্ন্যাসী ॥ দৈত্য ॥ ভূত ॥ অলৌকিক মেয়ে পরীরাণী ॥ গোলাপবালা ॥ সন্ধ্যামালতী ॥ অন্যান্য ৩।৪ জন ফুলপরী ॥ মন্ত্রী ॥ সেনাপতি প্রহরী ॥ সৈন্যদল ॥ সন্তর মা ॥

[১ম দৃশ্য]

[সন্তুদের বাড়ীর সম্মুখস্থ ছোট্ট বাগান। বাগানের মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। ভোরের সোনালী রোদ বাগানে এসে পড়েছে। একটি মোড়া পাতানো ; মোড়ার উপর একটি ছড়া-ছবির বই। সন্তু তু'হাত ডানার মত নেড়েচেড়ে কেবল ঘুরছে। এমন সময় সহপাঠী, পাশের বাড়ীর ছেলে, মণ্টুর প্রবেশ।]

মণ্টু ঃ এই সন্তু কি করছিস রে, এই সন্তু— [সন্তু কোন জবাব না দিয়ে ঘুরতে থাকে] বারে ! এই সন্তু, এই রকম ভোঁ ভোঁ করে ডানা তুটো মেলে ঘুরছিস কেন ? বল্‌না ? এই সন্তু—

সন্তু ঃ [ঘুরতে ঘুরতে] চুপ্‌ কথা বলিস নে, আমি ফুলপরীদের দেশে যাচ্ছি।

মণ্টু ঃ ফুলপরীদের দেশে যাচ্ছিস না হাতি। কিছুতেই যেতে পারবিনে তুই। দেখে নিস্‌।

সন্তু ঃ [ঘুরতে ঘুরতে] আলবৎ যেতে পারবো। বইয়ে লেখা আছে।

মণ্টু ঃ বই-এ লেখা আছে ? কই বই দেখি ?

[সন্তু থামল। হাঁপাতে হাঁপাতে বই হাতে নিয়ে এল]

সন্তু ঃ বিশ্বেস করলি নে তো ? এই গ্যাখ কি লেখা আছে। [জোরে সুর করে পড়তে থাকে]

যাব আমি ফুলপরীদের দেশে
হাত ত্বখানি ডানা মেলে
পাখীর মত হেলে ছুলে
হাওয়ায় ভেসে ভেসে
পৌঁছব আমি ফুলপরীদের দেশে ॥

—কি আমি মিছে বলেছি ?

মণ্টু ঃ তাই তো রে ! আমায় নিবি সন্তু তোর সাথে ? চল্ না তুজনে মিলে যাই ! তোর একা ভাল লাগবে ফুলপরীদের দেশে ? তুজনে গেলে ওদের দেশে গিয়ে বেশ মজা করে গল্প করবো। জানিস সন্তু, আমারও কতদিনের ইচ্ছে ফুলপরীদের দেশে যাবো। কতদিন গাছের মগ-ডালে বসে বসে কাটিয়েছি, যদি দেখা মেলে ফুল-পরীর। এই সন্তু, নিবি আমায়, নে-না ভাই ! তোকে আমি রোজ ইস্কুলে চীনেবাদাম কিনে দেবো। নিবি ?

সন্তু ঃ তাহলে আর দেরী করিস নে, নে শুরু কর।

[তুজনে আবৃত্তি করে ডানা মেলে ঘুরতে থাকে। কিছুক্ষণ ঘুরে মণ্টু বলে]

মণ্টু ঃ এই সন্তু, থাম্, থাম না—কৈ একটুও তো উপরে উঠছি নে। বইয়ে ঠিক লেখা আছে তো ? [সন্তু বিরক্ত ভাবে]

সন্তু ঃ দেখলি নে বই ? থামিস নে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখবি সাঁ-ই করে আকাশে উঠে গেছি।

মণ্টু ঃ না রে, শোন-থাম্। আর একটা উপায় আছে। [সন্তু থামে]

সন্তু ঃ কি উপায় বল্ [বিরক্ত]

মণ্টু ঃ জানিস একদিন মা না বলেছিলেন, চোখ বুঁজে ধ্যান করলে নাকি সাধু সন্ন্যেসীরা এসে দেখা দেন। আর ওদের কাছে যা চাওয়া যায় তাই মুঠো ভর্তি করে দেন। চল্ আমরা চোখ বুঁজে একমনে সাধু সন্ন্যেসীর ধ্যান করি। আমাদের ধ্যানে খুশি হয়ে এক-আধ জন সাধু সন্ন্যেসী এলে তুজনে তুপায়ে জোর চেপে ধরব। আর বলবো, ফুলপরীদের দেশে যাবার ব্যবস্থা করে দাও, নইলে কিছুতেই ছাড়ছিনে পা।

সন্তু ঃ ঠিক বলেছিস রে মণ্টু, সাধু সন্ন্যেসীরা সব করতে পারে। চল আমরা ধ্যানে লেগে যাই।

[তুজনে পাশাপাশি বসে চোখ বুঁজে ধ্যান, করতে থাকে। মৃত্ন, আবহ সঙ্গীত ক্রমে তীব্র ও দ্রুত লয়ে চলতে থাকবে। এমন সময় মাথায় জটা, মুখে শ্বেতশুভ্র গোঁফদাঁড়ি, রক্ত বস্ত্র পরিহিত এক সন্ন্যাসীর প্রবেশ, এক হাতে দীর্ঘ ত্রিশূল। সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালো সন্তু মণ্টুর সম্মুখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল।]

সন্ন্যাসী ঃ ক্রীং হ্রীং ফট্।
বলো চট্ পট্ ॥
কিং তব কামনা।
পূরাবো সব বাসনা ॥
বর লহ মাগিয়া।
চোখ তুটি খুলিয়া ॥
ক্রীং হ্রীং ফট্ ফট্।
ধর লহ ঝট্ পট্ ॥

মণ্টু ঃ এ্যা। [চোখ খুলে, তুহাতে চোখ মুছে] কী দেখছি রে ! সন্ন্যেসী বাবা ! এই সন্তু পায়ে পড়্—পায়ে পড়। [এক পা জড়িয়ে ধরল]

সন্তু ঃ এ্যা। সন্ন্যেসী বাবা ! [অন্য পা ধরল]

সন্তু, মন্টু : সন্ন্যেসী বাবা, ফুলপরীদের দেশে যাবো, উপায় করে দাও বাবা,—

সন্ন্যাসী : [সুর করে]

ক্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা।
খুশি আমি খুব আহা ॥
ছাড় ছাড় পা দু খানি।
যাহা চাও দিব আনি ॥

দুজনে : না সন্ন্যেসী বাবা পা ছাড়ছিনে। ফুলপরীদের দেশে যাবো। একটা উপায় করে দিতেই হবে।

সন্ন্যাসী : [সুর করে] ক্রীং হ্রীং ফট্ ফটি
ধরো এই অংগুটি
[আংটি দিলেন]

মন্টু : এ্যাঁ। আংটি! [বসে] কৈ, দাও বাবা, আমাকে দাও?

সন্তু : না বাবা, আমাকে দাও। [উভয়েই আংটি চাইতে থাকে]

সন্ন্যাসী : [সুর করে]

ক্রীং হ্রীং ফট্ ফট্
চলে যাবো চট্ পট্ ॥
কর যদি ঝগড়া
লাগে তবে বাগ্ড়া ॥
এক জনে লও হাতে
আর জন চল সাথে ॥
দুই জনে যাবে ভেসে
মহাসুখে পরী-দেশে ॥

মন্টু : এক জনে আংটি হাতে নিলে দুজনেই যেতে পারবো! তাহলে আর ভাবনা কি। তুই নে সন্তু, তোর কাছেই আংটি রেখে দে।

সন্তু : না না, তুই নিস্ না কেন? আমি যাবো তোর সাথে।

মন্টু : না তুই নে—

সন্তু : না তুই নে—

মন্টু : না রে, আমি আবার হারিয়ে ফেলবো। তোর কাছেই রেখে দে।

সন্তু : তা হলে সন্ন্যাসী বাবা তোমার যাকে ইচ্ছে তার হাতেই আংটি দাও।

সন্ন্যাসী : [সুর করে] ক্রীং হ্রীং ফট্ ফট্
আংটি ধর চট্ পট্
[সন্তুকে দিলেন]

সন্তু : বাঃ কি সুন্দর আংটি!

মন্টু : কৈ দেখি—

সন্তু : এই ত্যাখ, কি ঝলমল করছে! এই আংটি দিয়ে কি করবো সন্ন্যেসী বাবা?

সন্ন্যাসী : [সুর করে]

ক্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা।
যাহা চাও পাবে তাহা ॥
আদেশ কর আংটিকে।
দিবে এনে পলকে ॥
টক্ ঝাল মিঠে কড়া রকমারী খাদ্য।
আংটিকে বল দেখি এনে দেব সদ্য ॥
সোনা দানা চুনি পান্না রাজকীয় বস্ত্র।
বল্লম ও তলোয়ার যত আছে অস্ত্র ॥
চলে যাও উত্তরে।
কৈলাস শিখরে ॥
তারপর সোজা পথ।
পুরিবে মনোরথ ॥
ক্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা।
যাহা চাও পাবে তাহা ॥

[এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবহ সঙ্গীতের ঝংকার, আলোর চমক এবং সন্ন্যাসীর অন্তর্ধান ।]

সন্তু : এ্যাঁ সন্ন্যেসী বাবা চলে গেল ? তাহলে পরীর দেশে যাবো কি করে ?

মণ্টু : এই আংটিকে বললেই তো সব ব্যবস্থা করে দেবে, চল্ আগে একটু পরখ করে নি। আচ্ছা কি আদেশ করা যায় বল না ?

সন্তু : এই আংটি দুই প্লেট ভালো ভালো রসগোল্লা, সন্দেশ, নিয়ে এসো দেখি—

[হঠাৎ আলোর ঝলক, একটি শাড়ী পরা ফুটফুটে মেয়ে দু হাতে দু প্লেটে সন্দেশ ও রসগোল্লা নিয়ে এল। মণ্টু ও সন্তুর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল, কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে ।]

মণ্টু : একি স্বপ্ন দেখছিরে সন্তু! দেখ্ কি বড় বড় রসগোল্লা, কত্ সন্দেশ। চল্ সন্তু আর দেরী না করে লেগে যাই।

[এগিয়ে গিয়ে একটি প্লেট হাতে নিয়ে খেতে লাগলে]

সন্তু : এই তো কি আশ্চর্য! ও হঠাৎ এলো কোত্থেকে ? তুমি কে ভাই ? তোমার নাম কি ? তুমি কোথায় থাকো, কে তোমায় পাঠিয়েছে ? এত মিষ্টি সন্দেশ তুমি কোথায় পেলে ভাই ?

মণ্টু : দূর বোকা, আগে পেটে ঠেসে নে, তারপর কথা বলিস। শেষে না অমন খাওয়াটা হাতছাড়া হয়ে যায় ?

[খেতে থাকে]

সন্তু : কি ভাই ? তুমি কথা বলছ না যে।

মণ্টু : বোধ হয় বোবা না হয় কালা, তা খাবার পেয়েছিস্ খেয়ে নে। খোঁজাখুঁজির দরকার কি বাবা ?

সন্তু : ও, তুমি কথা বলবে না ভাই ? তবে একটা রসগোল্লা খাও—

[প্লেটটি হাতে নিতেই আলোর ঝলক ও রোমাঞ্চকর আবহসঙ্গীত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে যাবে।]

সন্তু : দেখলি মণ্টু মেয়েটি একটা কথাও না বলে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল! কি অবাক কাণ্ড।

মণ্টু : আরে আগে খেয়ে নে। দ্যাখ্ খেয়ে, অমন রসগোল্লা ও সন্দেশ জীবনেও খাসনি!

সন্তু : না ভাই মনটা বড্ড খারাপ লাগছে, মেয়েটি একটি সন্দেশও না খেয়ে চলে গেল—

মণ্টু : ও তুই দেখছি ফুলপরীদের কথা বেমালুম ভুলে আছিস্।

সন্তু : তাই তোরে, চল এক্ষুণি যাত্রা শুরু করি।

মণ্টু : খেয়ে নে পেট পুরে। অনেক পথ চলতে হবে যে—

সন্তু : এই খেয়ে নিচ্ছি— [খেতে থাকে]

মণ্টু : আর আমাদের পায় কে ? এবার ফুলপরীদের দেশে গিয়ে কত নাচ গান হাসি। ফুর্তি, খাওয়া দাওয়া করব। আর আমাদের পায় কে !

সন্তু, মন্টু : [গান ধরে]

আর আমাদের পায় কে ?
যাবো মোরা পরীর দেশে
চোখের পলকে—
সাজবো মোরা রাজার সাজে
হাসির ঝলকে।
ফুলপরী গো ফুলপরী
কোথায় তুমি থাকো
তোমার দেশের দুয়ার খোলা
লুকিয়ে থেকো না কো
ওগো লুকিয়ে থেকো না-কো ॥

[**২য় দৃশ্য**]

[সুন্দর বনভূমি। রং বেরঙের ফুলে ফলে গাছ ভরা। রঙীন আলোর ঝলক। এক স্বপ্নপুরী যেন। মাঝে মাঝে মিষ্টি সুর বাতাসে ভেসে আসছে। সন্তু, মন্টুর প্রবেশ। উভয়ের রাজপুত্রের পোশাক]

মন্টু : চল্ ফিরে যাই সন্তু। আর পরীর দেশে গিয়ে কাজ নেই। আর হাঁটতে পারছিনে। [বসে পড়ে] দূর ছাই, এমন জানলে তোর সঙ্গে আসতুমই না।

সন্তু : তুই না আসলে আমি একাই আসতুম। কতদিন ভেবেছি, ইস্, আমার যদি দুটো ডানা থাকতো, তবে পাখীর মত উড়ে যেতুম নীল আকাশের গায়ে। ভেসে ভেসে চলে যেতুম পরীর দেশে। জানিস্, কি সুন্দর দেশ এই ফুলপরীদের !

মন্টু : সুন্দর তো বুঝলুম, কিন্তু পা দুটো যে আর এগোতে চায় না গো। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলে গেলেন চলে যাও সোজা উত্তরে, কৈলাস পর্বত পেরোও, ব্যাস্ পৌঁছে যাবে ফুলপরীদের দেশে। হাঁটছি আর হাঁটছি, কোথায় ফুলপরীদের দেশ, কে জানে বাবা! এদিকে পেটও চোঁ চোঁ করছে।

[মন্টু চারদিকে ঘুরে দেখছে।]

সন্তু : তা হলে আংটিকে বলি খাবার এনে দিক।

মন্টু : আংটির খাবার তো রোজই খাচ্ছি।

[হঠাৎ একটা ফলগাছ দেখতে পায়]

—ছাখ্ ছাখ্ সন্তু, গাছে লাল টুকটুকে কত ফল, চল্ পেড়ে নিয়ে খাই। ভারী মজা হবে।

সন্তু : কার ফলগাছ জানি নে, কাউকে না বলে খেলে যে চুরি করা হবে।

মন্টু : ও-তুই দেখছি পাণ্ডবদের বড় ভাই যুধিষ্ঠির হয়ে গেছিস। আচ্ছা তুই দাঁড়া, আমি ফল পেড়ে নিয়ে এলাম বলে—

[মন্টু দৌড়ে গিয়ে গাছে হাত দিতেই বিকট হাসির শব্দ। দূর থেকে ভেসে আসে—হাঃ হাঃ হাঃ হীঃ হীঃ হীঃ। উভয়ে চমকে উঠে। মন্টু ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে আসে।]

সন্তু : মন্টু! ফল পারতে যাসনে। কি বিকট শব্দ! আমার বড্ড ভয় করছে রে! শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠছে! শেষে কোন্ বিপদে না পড়ি আবার ?

মন্টু : এদিক ওদিক চেয়ে কিছু না দেখতে পেয়ে] তুই বড্ড ভীতু সন্তু। তোর হাতে সন্ন্যেসীর আংটি রয়েছে তবু এত ভয়? আমি যাই, এক্ষুনি অনেক ফল পেড়ে নিয়ে আসছি।

[মণ্টু দৌড়ে গিয়ে ফল পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকট হাসি। শোঁ শোঁ বাতাসে বনভূমি কাঁপতে থাকে। হাসি ক্রমশঃ এগোতে থাকে এবং মঞ্চে প্রবেশ করে এক দৈত্য। সারা শরীর লোমে ঢাকা। মূলোর মত দুটি বড় বড় দাঁত মাথায় দুটো শিং। দৈত্যকে দেখে সন্তু ও মণ্টু ভয়ে চীৎকার করে।]

মণ্টু ঃ পালা সন্তু পালা! ওরে বাপরে, খেয়ে ফেল্লরে! গেলুম রে—

সন্তু ঃ ও মাগো! আমি কিছু করিনি! আমি ফল পাড়িনি! আমার কোন দোষ নেই!

[সন্তু, মণ্টু পালাতে চাইলে দৈত্য অট্টহাসিতে পথ আগলে থাকে]

দৈত্য ঃ কচি কচি নরম মাংস মজা করে খাব। হাঃ হাঃ হাঃ—

[দু হাতে ধরতে যেতেই সন্তু মণ্টু ছুটোছুটি শুরু করে। মণ্টু কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে]

মণ্টু ঃ আর কোনদিন এখানে আসবো না গো দৈত্য মশাই। দোহাই তোমার, আমাদের ছেড়ে দাও!

সন্তু ঃ আমাদের খেয়ো না গো দৈত্য মশাই? আমরা আর কক্ষণো তোমার বাগানে আসবো না।

দৈত্য ঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তোরা কোত্থেকে এসেছিস? তোদের নাম কি?

সন্তু ঃ আমরা পৃথিবীর মানুষ দৈত্য মশাই। আমি ফল পাড়িনি গো। তোমার গাছের ফল পেড়েছে এই মণ্টুটা। তোমার পায়ে পড়ি দৈত্য মশাই আমাকে ছেড়ে দাও।

দৈত্য ঃ আরে তোরা পৃথিবীর মানুষ! মরতে এসেছিস্ এই পরীদের রাজ্যে? আমি এই রাজ্যের প্রহরী। পৃথিবীর মানুষের এখানে আসা নিষেধ। আমার হাতে তোদের আজ রক্ষে নেই। [মণ্টুকে] ওটা ফল পেড়েছে, আগে ওটাকে খাব। হাঃ হাঃ হাঃ [মণ্টুর দিকে এগোয়, মণ্টু চিৎকার করে ওঠে]

সন্তু ঃ ভাবিসনে মণ্টু! [আংটিকে] এই আংটি, খুব ধারালো দুটো তলোয়ার নিয়ে এসো—

[সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে দুটো তলোয়ার নিয়ে প্রবেশ করল। সন্তু ও মণ্টু তলোয়ার হাতে নিতেই মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল]

মণ্টু ঃ [বীরের মত] আয় বেটা দৈত্য, এক কোপে সাবাড় করি তোকে।

দৈত্য—হাঃ হাঃ হাঃ, এই তলোয়ার দিয়ে আমাকে মারবি? তবে আয়, দুটোকে ধরে গিলে ফেলি। [যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। সন্তু, মণ্টু তলোয়ার ঘুরিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। হঠাৎ দৈত্য তাদের হাত থেকে এক ঝটকায় তলোয়ার দুটো কেড়ে নিল।]

মণ্টু ঃ [কাঁদো স্বরে] সন্তু, আর যে রক্ষে নেই! আর যুদ্ধ করবো না গো দৈত্য মশাই, দোহাই তোমার, আমাদের মাপ কর।

সন্তু ঃ ভাবিসনে মণ্টু! মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি এসেছে [আংটিকে] এই আংটি একটা ভূত নিয়ে এসো—

[দৈত্য অট্টহাসি দিয়ে যেমনি সন্তু মণ্টুকে ধরতে যাবে; তখনি গোঙাতে গোঙাতে ভূত এসে হাজির। ভূত দৈত্যকে পেছন থেকে ঘাড় মটকে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈত্য মাটিতে পরে গেল। সন্তু মণ্ট ভয়ে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল। দৈত্য মারা গেলে সন্তু মণ্টু বেরিয়ে আসে।]

মণ্টু ঃ [পা দিয়ে ঠেলে] কিরে বেটা দৈত্য, এখন কি ? এখন দেখি মাটিতে পড়ে আছিস্।

[ভূত এসে সন্তু-মণ্টুর সামনে দাঁড়াল।]

সন্তু ঃ [ভীত] আমরা খুব খুশি হয়েছি ভূত। তোমার শক্তি দেখে খুব খুশি হয়েছি। এখন যাও, আবার যখন ডাকবো তক্ষুণি চলে এসো কিন্তু—

[ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল]

মণ্টু ঃ উঃ, কি বাঁচাটাই না বাঁচলাম বাবা! এই ভূত বাবাজী না এলে তো আজ দৈত্যের পেটেই যেতে হতো। চল্ সন্তু, আর পরীর রাজ্যে ঢুকে কাজ নেই। ভালোয় ভালোয় ফিরে চল্—

[নেপথ্য ঝুম ঝুম নূপুরের শব্দ শোনা গেল]

সন্তু ঃ ঐ আবার না জানি কি আসছে। গাছটার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। [গাছের আড়ালে লুকাল। সাত পরীর নৃত্য করতে করতে প্রবেশ]

[পরীদের নৃত্য]

গোলাপবালা ঃ চল্ সবাই ঘরে ফিরে যাই। সেই কখন বেরিয়েছি, দেরী হলে রাণী বকুনি দেবেন আবার।

সন্ধ্যামালতী ঃ হ্যাঁ তাই চল্ গোলাপদি। এবার ঘরে ফিরি সবাই।

সকলে ঃ তাই ভালো, তাই ভালো, চলো সবাই ঘরে চলো।

[অগ্রসর হতেই মৃত দৈত্যকে দেখে সকলে চমকে উঠল।]

গোলাপ ঃ ও মা গো! এই ত্থাখ, তোরা, আমাদের বাগানের পাহারাদার না? হ্যাঁ, দৈত্যটা মরে পড়ে আছে যেন ?

[সকলে তাকাল]

সন্ধ্যামালতী ঃ তাই তো গোলাপদি, দৈত্যটা মরেই তো পড়ে আছে ? কে অমন কাজ করল ? আমাদের কতই না আদর করতো। কে মারলে ওকে ?

গোলাপ ঃ কে মারলে ? কার এত সাহস ? চল সন্ধ্যামালতী, চল্ সবাই রাণীকে খবর দিতেই হবে।

সকলে ঃ দেরী নয়, দেরী নয়, রাণীকে খবর দিতেই হবে।

সন্ধ্যা ঃ ইস্ আমার ভীষণ কষ্ট লাগছে রে। [দৈত্যের কাছে বসে]

গোলাপ ঃ চল্ সবাই চল,—

[সকলের প্রস্থান। সন্ধ্যামালতী একটু দেরী করে যাবে। এমন সময় সন্তু ছুটে গিয়ে সন্ধ্যার আচল ধরল।]

সন্ধ্যা ঃ [চমকে উঠে] কে ? কে তোমরা ? ছাড়, আঁচল ছাড় বলছি ?

সন্তু ঃ ছাড়বনা ফুলপরী। ছাড়বো বলেই এত কষ্ট করে এসেছি বুঝি ? ইস্ তুমি কি সুন্দর ফুলপরী ? কি সুন্দর তোমার পোষাক।

মণ্টু ঃ কি সুন্দর তুমি নাচ। তোমাদের রাজ্যে আমাদের নিয়ে যাও না ফুলপরী ?

সন্তু ঃ তুমি যা চাও তাই তোমায় দেব আমি। জানো ফুলপরী, এই আংটিকে বললে সব কিছু এনে দেয়।

মণ্টু ঃ [ডেকে নিয়ে] এই সন্তু, বোকা কোথাকার, আংটির কথা বলিস্ নে ?

সন্ধ্যা : কি বলছো তোমরা। কোত্থেকে এসেছো ?

সন্তু : আমরা পৃথিবীর মানুষ। ঐ যে নীচে গোল পৃথিবী ওখান থেকে দিন রাত হেঁটে হেঁটে এসেছি। কত কষ্ট করে এসেছি ফুলপরী। আমাদের তুমি তোমাদের দেশে নিয়ে যাবে বলো ফুলপরী।

মন্টু : আমাকেও নিয়ে যাবে বলো ফুলপরী ?

সন্ধ্যা : এ্যাঁ, তোমরা পৃথিবী থেকে এসেছো ? সর্বনাশ ! রাণী জানতে পারলে তোমাদের এক্ষুণি মেরে ফেলবেন। তোমরা এক্ষুনি চলে যাও, আর দেরী কর না।

মন্টু : চল্ সন্তু, ফিরে চলে যাই—

সন্তু : না, আমি কিছুতেই যাব না। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে যদি না নাও, তোমাকে আমি ছাড়বোই না। [পথ আগলে দাঁড়ায়] যাও দেখি, কেমন করে যাবে !

সন্ধ্যা : আঃ, কি বিপদেই না পড়লুম তোমাদের নিয়ে ; না বাপু তোমরা ঘরে ফিরে যাও।

সন্তু : না ফুলপরী, তুমি আমাদের ফেলে যেও না।

সন্ধ্যা : আচ্ছা শোন—তোমরা যখন না গিয়ে ছাড়বেই না—তখন এসো আমার সঙ্গে। তবে একটা কথা, খুব চুপি চুপি এসো। যাতে কেউ টের না পায়। আমি তোমাদের লুকিয়ে রাখব আমাদের বাগানের ঝোঁপের আড়ালে। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, তখন আমি তোমাদের আমাদের রাজ্যটা ঘুরে ঘুরে দেখাবো।

সন্তু : হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই চল—

[প্রস্থান]

(৩য় দৃশ্য)

[পরীদের বাগান। বাগানে নানা রঙীন ফল ফুলের গাছ। সোনালী রুপোলী গাছের পাতা। একটা স্বপ্নপুরী যেন। গভীর রাত। মন্টু, সন্তু ও সন্ধ্যামালতীর প্রবেশ]

সন্ধ্যা : খুব সাবধান ! পা টিপে টিপে চুপি চুপি আমার সাথে এসো। টু শব্দটি করোনা যেন ! রাণী জানতে পারলে তোমাদেরও প্রাণ যাবে, আমারও প্রাণ যাবে।

মন্টু : দ্যাখ্ সন্তু, কি সুন্দর ফুল ! একটা পেড়ে নিই ?

সন্ধ্যা : আঃ বল্লাম যে কথাটি বলো না ! তাহলে আমি যাচ্ছিনে তোমাদের সঙ্গে।

মন্টু : বাঃ রে ! তুমি রাগ করো কেন ফুল-পরী। এমন বাগান আমি জীবনেও দেখিনি !

সন্ধ্যা : তোমরা তো জান না আমার দিদিটা না ভারী হিংসুটে। যদি জানতে পারে পৃথিবীর মানুষকে আমি ঠাঁই দিয়েছি, তবে তখুনি রাণীর কাছে গিয়ে বলে দেবে। তোমরা তাড়াতাড়ি ঘুরে দেখে নাও, বাগানটা। আমি কিন্তু বেশী দেরি করতে পারব না।

সন্তু : তাহলে তুমি চলে যাও ফুলপরী, আমাদের জন্য তুমি মিছামিছি কষ্ট করো না।

সন্ধ্যা : না-না এসো তাড়াতাড়ি, সব তোমাদের দেখিয়ে দিই।

মন্টু : [চিৎকার করে] দেখ্ছিস সন্তু কি সুন্দর গাছ ! রূপোলী পাতা, সোনালী ফুল।

সন্তু : তুই থাম তো মন্টু ! তোর এই গলা-ফাটানো কথার জন্যে যদি আবার ধরা পড়ে যাই ?

সন্ধ্যা : এই শোন, এবার এদিকে দেখে যাও ; এমন দীঘি পৃথিবীর কোথাও নেই।

[নেপথ্যে গোলাপবালার কণ্ঠ—সন্ধ্যামালতী-সন্ধ্যামালতী] সর্বনাশ ! দিদি আসছে। এখন কি করি ? তোমাদের কোথায় লুকোই ? শিগ্‌গীর কোথাও লুকিয়ে পড় ?

মণ্টু : চল্ সন্তু, ঐ গাছটার আড়ালে গিয়ে লুকোই।

[গোলাপবালার প্রবেশ। সন্ধ্যামালতী অন্যমনস্ক ভাবে বসে রইল]

গোলাপবালা : সন্ধ্যামালতী। এত রাত্তিরে একা বাগানে বসে কি করছিস ?

[এদিক ওদিক তাকিয়ে] কারা যেন ছুটে পালিয়ে গেল ! এই সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা : ও দিদি, তুই এসেছিস, ভালই হল—দ্যাখ, দ্যাখ, কি সুন্দর চাঁদ, কি মিষ্টি হাওয়া। চল্, আমরা নেচে নেচে গান গাই।

গোলাপ : থাম্ দেখি। সত্যি করে বল তো কারা ছুটে পালিয়ে গেল ?

[সন্ধ্যা আমতা আমতা করতে থাকে]

সন্ধ্যা : সত্যি বল্‌বো ? না-না কেউ না, কেউ না, কৈ, কেউ না-তো ?

[হঠাৎ মণ্টু একটা হাঁচি দিয়ে ওঠে। গোলাপও চমকে ওঠে।]

গোলাপ : কে, কে ওখানে ?

[ছুটে সন্তু ও মণ্টুর কাছে গেল]

কে ? কে তোমরা ? এদিকে এসো, কথা বলছ না যে ? কে তোমরা ? কোত্থেকে এসেছো ! এখানে কি করছো ওঠো বলছি, ওঠো ! [হাতে ধরে মণ্টু সন্তুকে দাঁড় করালো] ওমা, এ যে দেখছি পৃথিবীর মানুষ ! তোমরা কি করে এখানে এলে ? বুঝেছি, সবই সন্ধ্যামালতীর কাণ্ড।

সন্ধ্যা : [সভয়ে] না-না দিদি, আমি ওদের আনিনি। ওরা নিজেরাই এসেছে।

গোলাপ : মিথ্যে কথা বলছিস্ ! দাঁড়া, আমি এক্ষুনি রাণীর কাছে সব বলে দেবো। তোর এত বড় সাহস ! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

[ছুটে প্রস্থান]

সন্ধ্যা : দিদি যাসনে, তোর পায়ে পড়ি, দিদি—এখন কি হবে ?

সন্তু : তুমি কোন চিন্তা করো না ফুলপরী, এই যে আংটি। এই আংটিকে বললে এক্ষণি ভূতের রাজা ছুটে আসবে।

[এদিক ওদিক চেয়ে অস্থির হয়ে]

সন্ধ্যা : না, না ও তোমাদের কিছু করতে হবে না, তোমরা এক্ষুনি ছুটে পালিয়ে যাও। শিগ্‌গীর পালাও—

[সৈন্যদের কোলাহল শোনা গেল]

ঐ যে সৈন্যরা ছুটে আসছে। এখন কি করি ?

মণ্টু : সন্তু, ভূতকে ডাক না তাড়াতাড়ি।

সন্ধ্যা : তোমরা কিছু করো না। আমি রাণীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

[সৈন্য সহ গোলাপবালার প্রবেশ]

গোলাপ : বাঁধো বাঁধো পৃথিবীর এই দুই মানুষকে। আর সন্ধ্যামালতীকেও বাঁধো—

সন্তু : না-না, আমাদের বাঁধো, কিন্তু ওকে বেঁধো না গো ! ওর কোন দোষ নেই—

সন্ধ্যা : ঠিক আছে দিদি। আমাকেও বেঁধে নাও।

গোলাপ ঃ সবাই তোকে আদর করে—ভাল বাসে। তাই তুই যা খুশি করিস্! এবার মজা দেখবি।

[সৈন্যরা তিনজনকে বাঁধল]

চলো, নিয়ে চলো—

[সকলের প্রস্থান]

[৪র্থ দৃশ্য]

[পরীদের রাণীর সভা। রাণী বসে আছেন সিংহাসনে। এক পাশে মন্ত্রী, অন্য দিকে সেনাপতি। সম্মুখে সভাসদ।

সভ্যগণ ঃ জয়—পরী মহারাণীর জয় [তিন বার ধ্বনিত হবে]

রাণী ঃ মন্ত্রী, রাজ্যের সব খবর ভাল তো?

মন্ত্রী ঃ না মহারাণী, আমাদের রাজ্যে এক ভয়ানক শত্রুর আবির্ভাব ঘটেছে। আমাদের প্রহরী অজম্ভুত দৈত্যকে কে বা কারা হত্যা করেছে। বড় দুঃসংবাদ মহারাণী!

রাণী ঃ [চমকে উঠেন] অজম্ভুত দৈত্য নিহত! একি বলছেন মন্ত্রী? এও কি সম্ভব? কার এত বড় শক্তি! এই স্বপ্নের পুরীতে কে এল? সেনাপতি—

সেনাপতি ঃ আদেশ করুন মহারাণী—

রাণী ঃ অজম্ভুত দৈত্য নিহত! এ খবর পেয়েছ?

সেনা ঃ পেয়েছি মহারাণী।

রাণী ঃ কি আশ্চর্য্য! এ খবর পেয়েও চুপ করে বসে আছ? হত্যাকারী কি এখনও ধরা পড়েনি?

[সেনাপতির মাথা নীচু] আমি হত্যাকারীর সন্ধান চাই। মন্ত্রী, রাজ্যে ঘোষণা করে দিন, হত্যাকারীর খোঁজ যে এনে দিতে পারবে, তাকে এক হাজার মণিরত্ন উপহার দেওয়া হবে।

[সন্তু, মণ্টু ও সন্ধ্যামালতীকে নিয়ে গোলাপ-বালা ও সৈন্যদের প্রবেশ]

রাণী ঃ একি! এরা কারা! সন্ধ্যামালতীকে কে বেঁধেছে? কার এত বড় সাহস?

গোলাপ ঃ আদেশ করুন মহারাণী, আমি সঠিক খবর বলছি।

রাণী ঃ হ্যাঁ তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো, তোমাকে আমি অনুমতি দিলাম।

গোলাপ ঃ মহারাণী, অজম্ভুত দৈত্যের হত্যা-কারী হল পৃথিবীর এই মানুষ দুটো। অজম্ভুত দৈত্যের মৃত্যুর পর এদের দুজনকে বাগানে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। এদের সঙ্গে সন্ধ্যামালতী ও ছিল। আমি সৈন্য নিয়ে ওদের বেঁধে এনেছি।

রাণী ঃ শোন পৃথিবীর মানুষ, তোমরাই কি অজম্ভুত দৈত্যকে হত্যা করেছ? আমি জানতে চাই, এই কথা কি সত্য?

[সন্তু, মণ্টু চুপ] চুপ্ করে আছো কেন? উত্তর দাও?

সন্তু, মণ্টু ঃ [মাথা নীচু করে] হ্যাঁ মহারাণী, আমরাই দৈত্যকে হত্যা করেছি।

মন্ত্রী ঃ মহারাণী, পৃথিবীর মানুষের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা। ওরা না পারে এমন কোন কর্ম নেই। ওদের ছোট্ট মাথা নানা বুদ্ধিতে ভরা, কোন্ ভেল্কি লাগিয়ে দৈত্যকে হত্যা করেছে কে বলবে?

রাণী ঃ খুব চিন্তার কথা। এত বড় মহাশক্তি-শালী দৈত্যকে তোমরা হত্যা করেছ! আগে তোমাদের বিচার হউক।

মন্ত্রী : যথার্থ বলেছেন মহারাণী, আগে বিচার হউক।

রাণী : শোন পৃথিবীর মানুষ, তোমাদের প্রথম অপরাধ হল, তোমরা মানুষ হয়ে পরীর রাজ্যে ঢুকেছ। দ্বিতীয় অপরাধ হল—তোমরা দৈত্যকে হত্যা করেছ ; তোমাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। কি শাস্তি হবে মন্ত্রী ?

মন্ত্রী : আমিও তো ভাবছি মহারাণী কি শাস্তি হবে ?

রাণী : তোমাদের আমি নির্বাসন দণ্ড দিলাম।

মন্ত্রী : নির্বাসন দণ্ড ! খুব উচিত শাস্তি হয়েছে মহারাণী।

রাণী : না-না শাস্তিটা ঠিক হল না—

মন্ত্রী : হ্যাঁ মহারাণী, শাস্তিটা ঠিক হয়নি। ওদের আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিন।

রাণী : না মন্ত্রী, না। শাস্তিটা হয়নি, তোমাদের আমি প্রাণদণ্ড দিলাম।

[সন্তু, মণ্টু চমকে উঠে]

মন্ত্রী : খুব ভাল শাস্তি দিয়েছেন মহারাণী। প্রাণদণ্ডই সব চেয়ে বড় শাস্তি। ওহে পৃথিবীর মানুষ, তোমাদের ভাগ্যটা খুবই ভাল, সব চাইতে বড় শাস্তিটাই তোমরা পেয়ে গেলে।

রাণী : আর সন্ধ্যামালতী, তুমি আমাদের দেশের আইন না মেনে পৃথিবীর মানুষকে এখানে নিয়ে এসেছো। তাই তোমাকে শাস্তি দিলাম—পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। কি বল মন্ত্রী ?

মন্ত্রী : আপনার বিচার চমৎকার মহারাণী। অতি চমৎকার।

রাণী : সেনাপতি, ঐ দুটো পৃথিবীর মানুষকে উঁচু পাহাড় থেকে ধপাস করে নীচে ফেলে দাও।

সেনাপতি : যথা আজ্ঞা মহারাণী।

মণ্টু : না না মহারাণী, আমরা আর পরীর রাজ্যে আসবো না। আমাদের মাফ করে দিন।

রাণী : না। শিগ্‌গীর নিয়ে যাও সেনাপতি।

সন্তু : কিন্তু মহারাণী, আমার একটা প্রার্থনা আছে।

রাণী। বল কি প্রার্থনা ?

সন্তু : মহারাণী, আমাদের শাস্তি দিন, কিন্তু সন্ধ্যামালতীর কোন দোষ নেই ; ওকে ছেড়ে দিন। আমরা দোষী, তাই আমাদের শাস্তি দিন।

রাণী : আমি কারও কথাই শুনব না, আমি যে শাস্তি দিয়েছি এটাই ঠিক। [সেনাপতিকে] সেনাপতি, পাহাড়ের চূড়ো থেকে ওদের ফেলে এসে আমাকে জানাবে। [প্রহরীকে] প্রহরী, তুমি সন্ধ্যামালতীকে নিয়ে কারাগারে রাখো।

সেনাপতি : চল হে পৃথিবীর মানুষ, [সন্তু, মণ্টুর হাত ধরে]

চল চল—।

[প্রহরী সন্ধ্যামালতীকে নিয়ে চলল]

সন্ধ্যামালতী : আর দেখা হবে না পৃথিবীর মানুষ।

সন্তু, মণ্টু : আর দেখা হবে না সন্ধ্যামালতী।

[বলতে বলতে দুই বিপরীত দিকে সন্তু মণ্টু ও সন্ধ্যামালতীর প্রহরীসহ প্রস্থান]

রাণী : এসো গোলাপবালা, তোমার পুরস্কার তুমি নেবে—

[সকলের প্রস্থান]

[৫ম দৃশ্য]

[পরীর দেশের বাগান]

[মন্টু ও সন্তুর গান গাইতে গাইতে প্রবেশ]

গান

সন্তু : ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্

মন্টু : তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্।

সন্তু : পাহাড় থেকে ফেলবে ছুঁড়ে করতে মোদের গুম্—

মন্টু : আমরা যেমন ছিলাম তেমনি আছি মনে খুশির ধুম।

সন্তু : সন্ন্যেসীর ঐ আংটির জোরে—

মন্টু : উল্টে সেনাপতি মরে—

সন্তু : দিচ্ছে চির ঘুম্—

সন্তু, মন্টু : আমরা যেমন ছিলাম তেমনি আছি আজকে খুশির ধুম্।

তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্

ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্॥

সন্তু : [হঠাৎ একটু ভেবে নিয়ে] কিন্তু, নারে মন্টু, সন্ধ্যামালতীর জন্যে মনটা ভারী খারাপ লাগছে।

মন্টু : ঠিক বলেছিস সন্তু, সন্ধ্যামালতী যে বসে বসে কারাগারে কাঁদছে। চল্, সন্ধ্যামালতীকে কারাগার থেকে নিয়ে আসি।

সন্তু : তাই চল্, কিন্তু কারাগারের চাবি কোথায় পাব? তাছাড়া কারাগারে খালি হাতে গেলে প্রহরীরা কেটে টুকরো করে ফেলবে।

মন্টু : তাই তো! তাহলে আংটিকে ডাক দিয়ে বলে দে হুটো তলোয়ার, কারাগারের তালার চাবি আর কিছু দড়ি নিয়ে আসতে।

সন্তু : [আংটিকে] এই আংটি, হুটো তলোয়ার ও পরীরাজ্যের কারাগারের চাবি নিয়ে এসো তো?

[সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে একটা পাত্রে করে একটা চাবি ও হুটো তলোয়ার নিয়ে হাজির। ওরা হাতে তুলে নিতেই অদৃশ্য।]

শোন্ মন্টু, তুই তো কেবল হৈ চৈ করিস, কারাগারে পা-টিপে টিপে যেতে হবে, তারপর চুপ্ চাপ কাজ সারতে হবে বুঝলি?

মন্টু : কিন্তু কারাগারের পথ চিনবো কি করে?

সন্তু : আরে সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। চল্ চুপি চুপি রাজবাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ি একবার। তারপর খুঁজে বের করে নেব কারাগার।

মন্ট : ঠিক আছে চল্।

[প্রস্থান]

[৬ষ্ঠ দৃশ্য]

[মঞ্চের এক পাশে কারাগার। কারাগারের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যামালতী মাটিতে শুয়ে আছে। প্রহরী বল্লম হাতে পায়চারী করছে। যখন প্রহরী দেখলো সন্ধ্যামালতী ঘুমুচ্ছে, তখন সেও বল্লমটি এক পাশে রেখে ঘুমুতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রহরী নাক ডাকতে শুরু করে। চুপি চুপি পা টিপে টিপে সন্তু-মন্টুর প্রবেশ। মন্টুর ইঙ্গিতে সন্তুকে বুঝিয়ে দিল যে, সে কাপড় দিয়ে প্রহরীর মুখ বাঁধবে এবং সন্তু যেন তখন চাবি দিয়ে কারাগারের তালা খুলে নেয়। খুব সাবধানে

তারা কাজ শেষ করল। মন্টু প্রহরীকে বাঁধল, তারপর দুজনে প্রহরীকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর কারাগারে ঢুকল।]

সন্তু : সন্ধ্যামালতী, সন্ধ্যামালতী, আমরা এসেছি। ওঠ সন্ধ্যামালতী—

সন্ধ্যা : কে ? কে তোমরা ?

সন্তু : আস্তে কথা বল। ভয় নেই, আমরা পৃথিবীর মানুষ।

সন্ধ্যা : তোমরা কি করে এলে! তোমরা মরনি!

সন্তু : আরে আমাদের মারে এমন সাধ্যি কার? এখন দেরী করো না। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, তাড়াতাড়ি এসো।

[এমন সময় একজন প্রহরী তাদের দেখে পালিয়ে গেল] 'সর্বনাশ হয়েছে, এই প্রহরীটা গিয়ে এক্ষুনি রাণীকে বলে দেবে, তার আগে আমরা পালিয়ে যাই। চল চল সন্ধ্যামালতী, আর একটুও দেরী করো না।

সন্ধ্যা : কিন্তু, আমি পৃথিবীতে যাবো কি করে, আমি তো পরী—

সন্তু : কিছু হবে না। তোমাকে আমাদের ঘরে লুকিয়ে রাখবো। কেউ দেখবে না। চলো চলো।

মন্ট : আর দেরী করো না! কেউ এসে পড়লে রক্ষা নেই। তাড়াতাড়ি—

[হঠাৎ পাগলা ঘন্টির আওয়াজ দূর থেকে শোনা যায়]

সন্ধ্যা : এক্ষুণি রাণীর সৈন্যরা সব এসে পড়বে। কি করবো আমি ?

মন্টু : কি আর করবে ? তাড়াতাড়ি পালাই চল— [তিনজনে অগ্রসর হতেই সৈন্যদের নিয়ে রাণীর প্রবেশ]

রাণী : সৈন্যগণ এক্ষণি এদের মেরে ফেল। এদের এত বড় সাহস যে—

মন্টু : সন্তু, যমভূত কে আসতে বল্। এসো পরীররাণী, মজা দেখবে এসো।

সন্তু : [আংটিকে] আংটি যমভূতকে পাঠাও—

[তীব্র আওয়াজ করে ভূত এল। এক একটা করে সৈন্য মারতে লাগল। সৈন্যরা ভয়ে পালাতে লাগল। ভূত রাণীকে ধরতে গেল। রাণী ভয়ে চিৎকার করে উঠল। সন্ধ্যামালতী দুহাতে চোখ মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।]

রাণী : বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, সন্ধ্যামালতী বল না ওদের, ভূতকে থামাতে। ও-মাগো, খেয়ে ফেললে গো!

সন্ধ্যা : পৃথিবীর মানুষ, তোমরা আমাদের রাণীকে মেরো না।

রাণী : আমাকে মেরো না। তোমরা যা চাও তাই তোমাদের দেবো।

সন্তু : সত্যি বলছো ? [রাণী সম্মতি জানাল] আংটি ভূতকে চলে যেতে বলো।

[ভূত অদৃশ্য হল]

রাণী : [হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়াল] পৃথিবীর মানুষ, তোমরা যা চাও তাই দেব, তবুও ঐ ভূতকে আর ডেকো না।

মন্টু : আমরা যা চাই, তাই দেবেন মহারাণী ?

রাণী : হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দেব।

উভয়ে : আজ থেকে আমরা পরীর দেশের অর্ধেক রাজত্ব চাই।

রাণীঃ হ্যাঁ, তাই হবে। এই কে আছিস্, ডাক সবাইকে, মন্ত্রী, সেনাপতি পাত্রমিত্র সবাইকে ডাক।

[সকলে হাজির। ফুলপরীরাও এলো]

মন্ত্রী, রাজ্যে ঘোষণা করে দিন যে, আজ থেকে এই পৃথিবীর দুই মানুষকে আমি আমাদের দেশের অর্ধেক রাজত্ব দিলাম—

মন্ত্রীঃ যথা আজ্ঞা মহারাণী।

রাণীঃ চল মন্ত্রী, আমরা যাই।

মণ্টুঃ দাঁড়ান রাণীমা, দাঁড়ান, আমাদের কিছু কথা আছে।

রাণীঃ কি কথা ?

সন্তুঃ সন্ধ্যামালতী, তোমার জন্যেই আমরা অর্ধেক রাজত্ব পেলাম। তুমি যা চাও তাই তোমাকে দেবো। কি চাও বলো ?

সন্ধ্যাঃ তাহলে তোমরা আমাদের রাণীকে রাজত্ব ফিরিয়ে দাও। তোমরা এমনিতেই আমাদের দেশে থাকো। আমরা নাচগান, ফুর্তি করে দিন কাটাবো।

মণ্টুঃ এমন রাজ্যটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দিবি ?

সন্তুঃ আমরা পরীর রাজ্য দিয়ে কি করবো বল ? আর আমরা না বলেছি সন্ধ্যামালতী যা চাইবে তাই দেবো ?

মণ্টুঃ হ্যাঁ তাই তো—

মণ্টু, সন্তুঃ তোমাদের রাজ্য তোমাদের ফিরিয়ে দিলাম সন্ধ্যামালতী। এসো এবার আমরা একটু নাচ গান করি।

[সন্ধ্যা সহ সকলে নাচতে থাকে]

ধিন্ ধিনা ধিন্ ধিন্
আজকে বড় মজার দিন
নাচবো মোরা তাধিন ধিন্।

[সন্ধ্যাকে মধ্যে রেখে সবাই নাচতে থাকে। নাচতে নাচতে এক ফাঁকে সন্তু অদৃশ্য হয়ে যাবে, অন্যেরা নাচতে থাকবে]

[৭ম দৃশ্য]

[সন্তুদের বাড়ী। সন্তু, ও তার মা বিছানায় শোয়া। হঠাৎ সন্তু সুর করে গেয়ে উঠে— 'তাধিন্ ধিন্'।]

মাঃ সন্তু, ও সন্তু, কি বকছিস্ ঘুমের মধ্যে ? এই সন্তু ! সন্তু ?

সন্তুঃ [ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচলায়] এ্যাঁ ফুলপরী কই ? সন্ধ্যামালতী কই ?

মাঃ [বসে] ও স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি ? নে শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

সন্তু। কিন্তু ফুলপরী কোথায় গেল ?

মাঃ নে শুয়ে পড় তো দেখি ? ঘুমের মধ্যে কি আবোল তাবোল বকছিস্ ? [জোর করে সন্তুকে শুইয়ে দেয়।

[আগরতলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত]

যবনিকা

বিদ্যায় বৃহস্পতি



(এ াংকিকা)

ঃ চরিত্র ঃ

রাজা ॥ মন্ত্রী ॥ রাজকুমার ॥ বাচস্পতিমশাই ॥ কুশল ॥ রাজবৈদ্য ॥ মনোবৈদ্য ॥ ছেলেমেয়ের দল ।

[রাজগৃহ । রাজা ও মন্ত্রী কথা বলছেন]

রাজা ঃ মন্ত্রী, বিদ্যা বাচস্পতিমশাইকে কি সংবাদ দেওয়া হয়েছে ?

মন্ত্রী ঃ হ্যাঁ মহারাজ। তিনি হয়ত এক্ষুণি এসে উপস্থিত হবেন ।

রাজা ঃ জানেন তো মন্ত্রী, রাজকুমারের শিক্ষার ব্যাপারে আমি বড়ই উদ্বিগ্ন ।

মন্ত্রী ঃ আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই মহারাজ। বিদ্যা-বাচস্পতিমশাই সর্বশাস্ত্রবিশারদ। তিনি অল্পসময়ের মধ্যেই রাজকুমারকে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করে তুলতে পারবেন, ঐ যে তিনি এসে পড়েছেন ।

[বাচস্পতির প্রবেশ । পরণে ধুতি চাদর। মাথায় লম্বা শিখা। নাকের ডগায় চাঁদির চশমা। বয়স ষাটের উর্ধ্বে]

বাচস্পতি ঃ মহারাজার জয় হোক ।

রাজা ঃ আসুন, আসুন বাচস্পতিমশাই, আসন গ্রহণ করুন ।

বাচস্পতি ঃ [আসন গ্রহণ পূর্বক] আমি মহারাজের কি কাজে লাগতে পারি ?

রাজা ঃ বড় বিপদে পড়েই আপনার শরণ নিয়েছি বাচস্পতিমশাই। রাজকুমার দশম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ওর বিদ্যাশিক্ষালাভের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। আপনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ। আমার ইচ্ছে, রাজকুমারের শিক্ষার দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন। ওকে সর্ববিদ্যাবিশারদ করে তুলুন ।

বাচস্পতি ঃ মহারাজ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই আমার জীবনের ব্রত। অতএব আপনার পুত্রের শিক্ষাদানের দায়িত্ব আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম ।

রাজা : তাহলে যদি অনুমতি করেন, আগামী-কল্য কুমারকে আপনার গৃহে পাঠিয়ে দিই।

বাচস্পতি : সে মহারাজের ইচ্ছা। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। কুমার অচিরেই সকলশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে আপনার গৃহ আলোকিত করবেন। তাহলে আসি মহারাজ।

রাজা : আমি কৃতার্থ হলাম বাচস্পতিমশাই, আমি আজ নিশ্চিন্ত হলাম।

[**দৃশ্যান্তর**]

[বাচস্পতির গৃহ। মেঝেতে বসে কুমার পাঠরত]

বাচস্পতি : কুমার, তোমাকে যে ব্যাকরণের সূত্রগুলো লিখতে বলেছিলাম, তা লেখা হয়েছে ?

কুমার : হ্যাঁ গুরুমশাই, এই যে দেখুন।

[খাতা বাড়িয়ে ধরল]

বাচস্পতি : একী! সূত্রের নিচে দেখছি একটা ছবি এঁকে রেখেছো ? [খাতার পাতা উল্টাতে লাগলেন] কি আশ্চর্য! ছবি এঁকে খাতা ভরিয়ে দিয়েছ ? এই কি তোমার ব্যাকরণ পাঠ ?

কুমার : আমার ছবি আঁকতে ভালো লাগে।

বাচস্পতি : চুপ করো। জানো, পড়তে বসে ছবি আঁকা গুরুতর অপরাধ !

কুমার : ছবি আঁকতে আমার দারুণ ইচ্ছে করে।

বাচস্পতি : আর কথা বলো না। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কোনদিন যদি ছবি আঁক, তাহলে তোমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। শপথ কর, আর কোনদিন ছবি আঁকবে না।

কুমার : [মনমরা হয়ে] আর কোন দিন ছবি আঁকবো না।

বাচস্পতি : খুশি হলাম। আর কখনো এসব বাজে কাজ করবে না। এখন মনোযোগ দিয়ে পাণিনির সূত্রগুলো মুখস্থ করো তো ? আমি কিছুক্ষণ পর এসে তোমার পড়া নেব।

[প্রস্থান]

কুমার : [সুর করে বারবার ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করতে লাগল]

আখ্যাতম্ আখ্যাতেন ক্রিয়া সাতত্যে।

[এমন সময় বাচস্পতির ছেলে কুশল এসে চুপি দিল। কুশলের বয়স ৮-১০। পরণে ধুতি ফতুয়া]

কুশল : কুমার—কুমার শোন—

কুমার : কে ? ও কুশল ? এখন চলে যাও। আমি ব্যাকরণ মুখস্থ করছি।

কুশল : কুমার খেলবে এসো। দুজন মিলে ওই মাঠে ছুটোছুটি খেলিগে চল।

কুমার : ছুটোছুটি খেলতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু গুরুমশাই এসে পাঠ নেবেন যে।

কুশল : বাবার ফিরতে দেরী হবে। চল, এই ফাঁকে কিছু খেলে নিই।

কুমার : তাই চল কুশল। শুধু পড়া-পড়া-পড়া, ভালো লাগে কিনা, তুমিই বল।

কুশল : বাবাতো আমাকেও খেলতে দেন না। লুকিয়ে খেলি। কতদিন মার খাই। চল—দৌড়ে চল।

কুমার : চল—চল [ছুটে উভয়ের প্রস্থান]

[কিছুক্ষণ পর বাচস্পতিমশায়ের প্রবেশ]

বাচস্পতি : একী, কুমার গেল কোথায় ?

কুমার—কুমার—না, সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে। খুঁজে দেখতে হয়। [বেরিয়ে গেলেন ও আবার প্রবেশ করলেন] কুমার—কুমার—

[দ্রুত কুমারের প্রবেশ]

বাচস্পতি : পড়া ফেলে রেখে তুমি কোথায় গিয়েছিলে কুমার ?

কুমার : খেলতে গিয়েছিলাম।

বাচস্পতি : খেলতে গিয়েছিলে ? বুঝলাম, তুমি কত বড় পণ্ডিত হবে। খেলাধুলোয় যাদের মন তাদের লেখাপড়া হয় কখনো ? কালই তোমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

কুমার : খেলতে আমার খুব ভালো লাগে ওই সবুজ মাঠটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বাচস্পতি : আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই নে। শুধু জানতে চাই, আর কখনও খেলতে যাবে কিনা—

কুমার : আর কোনদিন খেলতে যাব না গুরুমশাই।

বাচস্পতি : প্রতিজ্ঞা করো আর কখনও খেলবে না।

কুমার : প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনও খেলব না।

বাচস্পতি : খুশি হলাম। তাহলে বসে বসে পাণিনির সূত্র মুখস্থ করো। আমি কিছুক্ষণ পরে এসে পাঠ নেব। [প্রস্থান]

কুমার : [সুর করে বারবার সূত্র পড়তে থাকে] কর্তরি কর্মব্যতিহারে।

[চুপি চুপি কুশলের প্রবেশ]

কুশল : (চাপা স্বরে) কুমার, কুমার—

কুমার : কে ? কুশল এসেছ ?

কুশল : হ্যাঁ, চল, খেলতে যাই। বাবা শিষ্য বাড়ী গেছেন। ফিরতে দেরী হবে।

কুমার : না ভাই, আর খেলতে যাব না। গুরুমশাই-এর কাছে শপথ করেছি যে।

কুশল : তোমার বুঝি খেলতে ভাল লাগে না।

কুমার : খুব ভাল লাগে। মনে হয়, এক্ষুণি ছুটে যাই ওই সবুজ মাঠে। কিন্তু আমার যে যাবার উপায় নেই—

কুশল : তাহলে তুমি সত্যিই খেলতে যাবেনা ?

কুমার : না ভাই—(দীর্ঘশ্বাস)।

কুশল : এসো তাহলে, একটা নতুন খেলা খেলি।

কুমার : কোন খেলাই খেলব না। প্রতিজ্ঞা যে।

কুশল : না না, খেলা নয়। তুমি দেখোই না ! আমি নিয়ে আসছি। [ছুটে গেল। একটু পরে একতাল কাদামাটি নিয়ে এল]

কুমার : এই মাটি দিয়ে কি করবে ?

কুশল : এই মাটি দিয়ে না কত জিনিস গড়া যায়। মাটি দিয়ে নানা জিনিস গড়তে আমি দারুণ ভালবাসি। নাও মাটি, তুমি একটা আম বানাও, আমি বানাচ্ছি পাখী।

কুমার : [মাটি দিয়ে আম বানাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কুশলের হাতের দিকে তাকাচ্ছে] ইস্ কি সুন্দর পাখী গড়ছ তুমি। আমার আম যে লাউয়ের মত হয়ে যাচ্ছে।

কুশল : নতুন তো। একটু অসুবিধে হবে বৈ কি। আমারও কি একদিনে হয়েছে ?

কুমার : তুমি আমায় শিখিয়ে দেবে কুশল ?

মাটি দিয়ে জিনিস গড়তে কি ভালোই না লাগছে আমার।

[এমন সময় বাচস্পতির প্রবেশ। বাচস্পতিকে দেখে কুশল ছুটে পালাচ্ছিল, কিন্তু পারল না]

বাচস্পতি : এই পালাচ্ছিস কোথা! দাঁড়া। এতদিনে বুঝলাম, ঘরের ইঁদুর বেড়া কাটছিস।

[কুশলের কান ধরলেন] বল্ আর কখনও ঢুকবি কুমারের ঘরে ?

কুমার : কুশলের কোন দোষ নেই গুরুমশাই।

বাচস্পতি : চুপ করো তুমি। [কুশলকে কান টানতে টানতে] বল্, আর কখনও কুমারের সঙ্গে কথা বলবি ? বল্—বল্—

কুশল : [কাঁদতে কাঁদতে] আর কোন দিন কুমারের ঘরে ঢুকবো না। কখনও কুমারের সঙ্গে কথা বলব না।

বাচস্পতি : চালকলাভোজী বামুনের ছেলে হয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে পাল্লা। বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে চাস। ফের যদি কোনদিন কুমারের সঙ্গে তোকে দেখি, তবে মাংসপিণ্ড বানিয়ে ছাড়ব। মনে থাকে যেন। যা—[ধাক্কা মেরে কুশলকে বিদায় করলেন। কুশল ছুটে পালাল]

[কুমারের প্রতি] কুমার, তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছ, আর কোনদিন খেলবে না।

কুমার : আমি তো খেলতে যাইনি গুরুমশাই। আমি মাটি দিয়ে আম গড়ছিলাম। কি মজাই না লাগছিল।

বাচস্পতি : ছিঃ ছিঃ, তুমি রাজপুত্র, তোমার কিনা এই কামার কুমোরের কাজের দিকে মন! ওসব হলো ছোটলোকের কাজ!

কুমার : কিন্তু মাটির কাজ করতে যে আমার খুব ভালো লাগে গুরুমশাই।

বাচস্পতি : ভালো লাগে! বুঝেছি। তোমার লেখাপড়া কতটুকু হবে। শোন, আমি তোমাকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছি। তাই যদি আমার আদেশ মত না চল, তবে তোমাকে এই মুহূর্তে মহারাজার কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব।

কুমার : আমি আপনার সব আদেশ মেনে চলব গুরুমশাই।

বাচস্পতি : তাহলে শপথ কর, অন্য কোন ছেলের সঙ্গে মিশবে না—

কুমার : শপথ করছি, অন্য কোন ছেলের সঙ্গে মিশব না।

বাচস্পতি : খেলাধুলো করবে না, মাটির কাজ করবে না—

কুমার : খেলাধুলো করবো না, মাটির কাজ করবো না।

বাচস্পতি : দিনরাত শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকবে—

কুমার : দিনরাত শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকব।

বাচস্পতি : ঘর থেকে কোথাও বেরোবে না—

কুমার : ঘর থেকে কোথাও বেরোব না।

বাচস্পতি : তাহলে শুরু কর অধ্যয়ন। পাণিনি —

কুমার : [ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করতে থাকবে] 'কর্মনি বাচ্যে প্রথমা'—

বাচস্পতি : চতুর্বেদ—

কুমার : (বারবার পড়তে থাকবে) ঋমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা—

বাচস্পতি ঃ উপনিষদ—

কুমার ঃ [বারবার বলতে থাকবে] ঈশাবাস্যমিদং সর্বং—

বাচস্পতি ঃ অষ্টাদশ পুরাণ –

কুমার ঃ [পুরাণের শ্লোক আবৃতি] পুরাণাং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণ্য স্মৃতম্।

বাচস্পতি ঃ শ্রীমদ্ভাগবতগীতা—

কুমার ঃ (বারংবার পাঠ) ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে—
(ধীরে ধীরে শ্লোক আবৃত্তির সুর মিলিয়ে যাবে)

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[রাজগৃহ। রাজা ও মন্ত্রী]

রাজা ঃ মন্ত্রীবর, আজ বড়ই আনন্দের দিন। দীর্ঘকাল পরে আমার প্রাণপ্রিয় পুত্র, গুরুগৃহে বিদ্যা-শিক্ষা লাভ করে ঘরে ফিরছে।

মন্ত্রী ঃ ওই যে দেখুন মহারাজ, রাজকুমারকে নিয়ে বাচস্পতিমশাই আসছেন।

[রাজকুমার ও বাচস্পতির প্রবেশ। কুমারের আকৃতির বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। পাগড়ি পরা মাথাটা খুব মোটা দেখাচ্ছে। হাত-পা শুকনো কাঠির মত। চক্ষু কোটরাগত। শরীর খুবই দুর্বল। অতি কষ্টে সে পা ফেলে চলছিল]

বাচস্পতি ঃ মহারাজার জয় হোক।

রাজা ঃ আসুন, আসুন বাচস্পতিমশাই আসন গ্রহণ করুন।

বাচস্পতি ঃ আপনার পুত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে মহারাজ। চতুর্বেদ, ষড়দর্শন, অষ্টাদশপুরাণ, উপনিষদ, সংহিতা, তন্ত্র, গীতাভাগবত সর্বশাস্ত্রে রাজকুমার এখন অদ্বিতীয়। যাকে বলে, বিদ্যায় বৃহস্পতি।

রাজা ঃ অত্যন্ত আনন্দিত হলাম বাচস্পতি মশাই। আপনার কাছে আমি চিরঋণী-চিরকৃতজ্ঞ! [কুমারের প্রতি] এসো বৎস, তোমাকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি।

[রাজকুমার এগোতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তার শরীর টলছিল]

মন্ত্রী ঃ কী হলো, কুমারের কি হলো! কুমার যে ঢলে পড়ে যাচ্ছে। [ছুটে গিয়ে কুমারকে বুকে নিলেন] মহারাজ, দেখুন, কুমারের কি দশা হয়েছে। মস্তিষ্ক বর্দ্ধিত, চক্ষু, কোটরাগত, অস্থিচর্মসার। এ কী করে হলো বাচস্পতিমশাই?

রাজা ঃ তাই তো! এই কে আছিস, শীগগীর রাজবৈদ্যকে ডাক্। হায়, হায়, কি হলো আমার পুত্রের! এখন কি করি? [বিহ্বলতা]

বাচস্পতি ঃ ও কিছু নয় মহারাজ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাহাড় প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং জ্ঞানলাভের ফলে কুমারের দেহটা কিছুটা ক্লান্ত হয়েছে। হবে না-ই বা কেন? বিদ্যালাভ ঈশ্বর-লাভের মতোই সুকঠিন। দেখুন মহারাজ, দেখুন, কুমারের মস্তিষ্ক কতখানি বর্দ্ধিত হয়েছে। মাথার আকৃতি কত বড় হয়েছে! অপার জ্ঞানলাভের জন্যেই তো তা সম্ভব হয়েছে মহারাজ!

মন্ত্রী ঃ কিন্তু কুমারের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত। এক্ষুনি ওর চিকিৎসা প্রয়োজন। বাচস্পতিমশাই, আপনি গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমরা কুমারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

বাচস্পতি ঃ মহারাজ, আপনারা ভাববেন না, কুমার শীঘ্র সেরে ওঠবেন। বিদ্যালাভ কঠোর তপস্যার ফল। এই তপস্যায় দেহ কিছুটা ক্ষীণ হয়। চলি মহারাজ, বিশ্রাম গ্রহণ করিগে—

(প্রস্থান)

(রাজবৈদ্যর প্রবেশ)

রাজা ঃ রাজবৈদ্য এসেছেন? দেখুন রাজবৈদ্য, কুমারের কি রোগ হয়েছে, সত্বর দেখুন। ওকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলুন। (রাজবৈদ্য কুমারের হাত-পা নাড়াচাড়া করে দেখলেন। জিভ দেখলেন। নাড়ী টিপে পরীক্ষা করলেন)

রাজবৈদ্য ঃ মহারাজ, এ বড় কঠিন রোগ। এর নাম অস্থিচর্মসার রোগ—

রাজা ঃ এ রোগ সারবে তো?

রাজবৈদ্য ঃ বিলক্ষণ! আমি রয়েছি কেন? এই রোগের জন্য বিশেষ বৃহৎ চটপটিবটিকা প্রস্তুত করে এক তোলা বায়বীয় বৃক্ষের ছালের রস, দেড়তোলা সৈন্ধবলবণের রস, দুই তোলা ছাগলাদ্য বটিকা এবং তিন তোলা হস্তিশৃঙ্গ সহ সেবন করতে হবে।

রাজা ঃ যে ব্যবস্থা উপযুক্ত, তা-ই করুন রাজবৈদ্য। আমি আর ভাবতে পারি নে। কুমার আমার বংশের একমাত্র সন্তান। যে ভাবেই হোক একে সুস্থ করে তুলুন।

[কুমার সহ সকলের প্রস্থান]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[রাজা ও মন্ত্রী বিরসবদনে আছেন]

রাজা ঃ আজ একমাস অতিক্রান্ত হলো। কুমারের সুস্থতার কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি নে। মন্ত্রী, তবে কি—তবে কি, আমার শিবরাত্রির সলতে আরোগ্যলাভ করবে না?

মন্ত্রী ঃ দুশ্চিন্তা করবেন না মহারাজ। দেশ-বিদেশে ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে—যে রাজকুমারকে সুস্থ করতে পারবে, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দান করা হবে।

[এমন সময় সারামুখে দাঁড়িগোঁফ, চোখে চশমা, ধুতিপাঞ্জাবী পরিহিত জনৈক মনোবৈদ্যের প্রবেশ]

মনোবৈদ্য ঃ মহারাজের জয় হোক।

রাজা ঃ আপনি কে? কি চান? আপনার পরিচয়?

মনোবৈদ্য ঃ আমি মনোবৈদ্য। আপনার পুত্রকে চিকিৎসা করতে চাই। রাজকুমারের রোগের বিবরণ যা শুনেছি, তাতে আমার বিশ্বাস, আমার চিকিৎসায় কুমার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

রাজা ঃ আপনি মনোবৈদ্য। অর্থাৎ মনের রোগের চিকিৎসক। আপনি কিভাবে আমার পুত্রের চিকিৎসা করবেন।

মনোবৈদ্য ঃ মহারাজ, আমার চিকিৎসা পদ্ধতি খুবই সহজ। রাজবাড়ীর প্রান্তে—যেখানে রয়েছে সুন্দর ফুলবাগিচা আর ঘাসেভরা সবুজ মাঠ—সেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করবেন। রাজকুমারও থাকবেন আমার সঙ্গে। আমি চিকিৎসা করবো। চিকিৎসার এক বছর পূর্ণ হলে আপনি যাবেন আপনার প্রিয় পুত্রকে দেখতে।

রাজা ঃ তাই হোক মনোবৈদ্য। আপনার হাতেই আমি কুমারকে সঁপে দিলাম। মন্ত্রী, যথাবিহীত ব্যবস্থা করুন।

মন্ত্রী ঃ যথা আজ্ঞা মহারাজ।

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[রাজবাড়ীর ফুলবাগান। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সহ রাজকুমার নেচে নেচে গান গাইছে। কাছে দাঁড়িয়ে মনোবৈদ্য, মুখে মৃদু হাসি]

ছেলেমেয়েদের গান

আমরা রঙীন আমরা সবুজ নবীন কিশলয় ধরায়
ফোটাই খুশির কুসুম, দুঃখ করি জয়।
মোদের কিসের ভাবনা
নেই দুঃখ যাতনা
হাসি খেলি নাচি গাহি আনন্দেতে ময় ॥

[গান শেষ হওয়ার আগেই রাজা ও মন্ত্রী এসে বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের নাচগান দেখছেন। ওঁদেরকে কেউ-ই দেখতে পায় নি। নাচগান শেষ হলে পর রাজা মনোবৈদ্যকে ডাকলেন]

রাজা : মনোবৈদ্য—

মনোবৈদ্য : মহারাজ এসেছেন? আসুন মহারাজ, আসুন। আমার কী সৌভাগ্য! আসুন মন্ত্রী মশাই—

রাজা : আজ পুত্রের চিকিৎসার এক বৎসর পূর্ণ হলো কিনা, তাই ওকে দেখতে এলাম।

মনোবৈদ্য : কি দেখলেন মহারাজ?

রাজা : আপনি আমার পুত্রের জীবন দান করেছেন মনোবৈদ্য। আমার আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। আপনার কাছে আমি চিরঋণী—চিরকৃতজ্ঞ। আমার পঙ্গু ছেলে যে এভাবে নৃত্যগীত করতে পারবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। এ অসম্ভব কি করে সম্ভব করলেন মনোবৈদ্য।

মনোবৈদ্য : মহারাজ, কুমারের আসল রোগ ছিল মনে, দেহে নয়। শিশুরা কি চায়? শিশুরা চায়—খেলাধুলো, নাচগান, আনন্দ, হৈ চৈ। রাজকুমারকে এসব থেকে বঞ্চিত করে বস্তা বস্তা পুথিপুস্তক গেলানো হয়েছিল। ওর মনের যে স্বাভাবিক চাহিদা, সেটাকে আমলই দেওয়া হয় নি। এত এত শাস্ত্রগ্রন্থ মাথায় বোঝাই হয়ে মস্তিষ্কটাই বেড়েছে, কিন্তু ওর মনের মৃত্যু হয়েছে। আজ আবার সে তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে। তাই সে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

রাজা : কি ওষুধের বলে ওকে সুস্থ করলেন মনোবৈদ্য?

মনোবৈদ্য : ওষুধ! তবে দেখুন মহারাজ! [রাজকুমারের আঁকা নানা ছবি, তার হাতের তৈরী কাগজের ও মাটির নানা ছবি, তার হাতের তৈরী কাগজের ও মাটির নানা জিনিস রাজাকে দেখালেন] এই ছবিগুলো রাজকুমার এঁকেছে, এই সব জিনিস রাজকুমার নিজের হাতে তৈরী করেছে। এই এক বছরে, সে প্রচুর খেলাধুলো করেছে, নাচগান করেছে। বন্ধুদের নিয়ে ভ্রমণ করেছে, চড়ুইভাতি করেছে, রাতদিন সে ছিল আনন্দে মশগুল। তিন তিনটে বছর সে তার স্বভাব অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে নি বলে, ওর যে ক্ষতি হয়ে গেল মহারাজ, তার সম্পূর্ণ পূরণ সম্ভব নয়! তবুও আজ সে প্রায় স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে।

মন্ত্রী : তাহলে কি বৈদ্যমশাই একথা বলতে হয় যে, শিশুরা লেখাপড়া না করে শুধু খেলাধুলো হৈ চৈ আনন্দ করেই দিন কাটাবে?

মনোবৈদ্য : তা নয় মন্ত্রী মশাই। শিশুদের শিক্ষা হবে আনন্দের মধ্য দিয়ে। ওরা যেমন বই পড়বে, লেখাপড়া করবে, তেমনি সাথে সাথে খেলাধুলো করবে, হাতের কাজ করবে, নাচগান করবে,

বেড়াবে, গল্প করবে, তবেই তো শিশুরা দেহে-মনে-আত্মায় সুন্দরভাবে গড়ে ওঠবে।

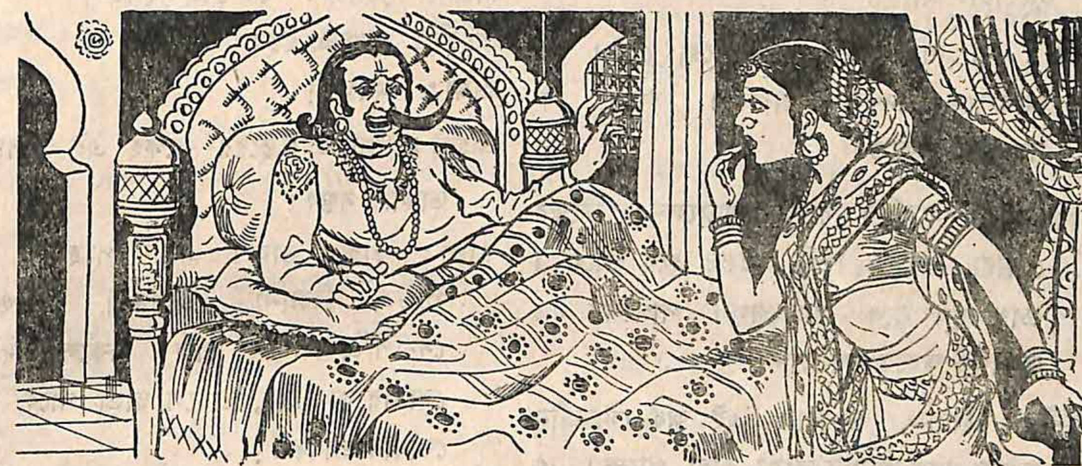
রাজা : এখন বুঝতে পারলাম, কেন আমার পুত্রের এমন দশা হয়েছিল। মনোবৈদ্য, আপনি আমার পুত্রের জীবনদান করেছেন আপনার কাছে আমি ঋণী। আপনাকে আমি মণি-রত্ন দিয়ে পুরস্কৃত করবো। আসুন মনোবৈদ্য, আপনি পুরস্কার গ্রহণ করবেন, আসুন!

মনোবৈদ্য : আমিও আজ খুবই আনন্দিত মহারাজ। আপনার ছেলেকে যে আবার স্বাভাবিক করে তুলতে পেরেছি, এই আমার বড় পুরস্কার। এবার ছেলেমেয়েদের নৃত্যগীত দেখুন মহারাজ!

[ছেলেমেয়েদের নৃত্যগীত]

—যবনিকা—

গোঁফ সংহার



ঃ চরিত্র ঃ

রাজা॥ মন্ত্রী॥ সেনাপতি॥ রাণী॥ প্রহরী॥ বিজ্ঞানী॥ পণ্ডিত॥ মহাগুপ্তচর॥ সভাসদগণ॥ রাজবৈদ্য॥ তরুণী॥ শ্রমিকগণ॥

[আজবপুরের মহারাজার প্রাসাদ। অন্দর মহলে সোনার পালঙ্কে মহারাজ নিদ্রিত। কিছুক্ষণ আগে সূর্যোদয় হয়েছে। রানী রাজাকে জাগাতে এসেছেন। কিন্তু রাজার মুখের দিকে চোখ পড়তেই রানী আঁৎকে উঠলেন ; তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন]

রানী ঃ [চিৎকার করে] একী! এ কি করে হলো? কে এমন সর্বনাশ করলে গো!

[চিৎকার শুনে রাজা ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে বসলেন]

রাজা ঃ কি হলো রানী? [দৌড়ে গিয়ে রানীকে দু'হাতে ধরলেন] কি হলো তোমার?

রানী ঃ [কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে] আমার নয় মহারাজ, আপনার।

রাজা ঃ আমার! চিৎকার দিলে তুমি? হলো আমার?

রানী ঃ হ্যাঁ মহারাজ, আমার নয় আপনার! হায় হায়—

রাজা ঃ না, না, আমার কিছু হয় নি। তোমার কি হয়েছে, বল রানী, বল—[ব্যস্ত হয়ে উঠলেন]

রানী ঃ না গো না, আমার নয়। সত্যি বলছি, আপনার! [করুণ কণ্ঠে] অর্ধেক নেই! হায় হায়! কে অমন সব্বোনাশ করলে গো!

[রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় রানী]

রাজা : [নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে] অর্ধেক নেই? কি বলছ তুমি রানী? এই তো আমি পুরোটাই আছি।

রানী : না না, পুরো নেই, পুরো নেই! ঐ আরশিতে দেখুন মহারাজ। হায়! কি সব্বোনেশে কাণ্ড!

[রাজা আরশির সামনে দাঁড়ালেন। নিজের চেহারা দেখেই তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগলেন]

রানী : মহারাজ, আপনার এই অর্ধ গোঁফহীন চেহারা দেখে আমার ভারী কান্না পাচ্ছে। এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছি না! আমি যাই মহারাজ, আমি যাই—

[চোখে আঁচল দিয়ে প্রস্থান]

রাজা : [সক্রোধে] প্রহরী—

[প্রহরী এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। মহারাজার দিকে চোখ পড়তেই থতমত খেয়ে গেল]

[কড়াস্বরে] কাল সারারাত পাহারা দিয়েছিলে?

প্রহরী : হ্যাঁ মহারাজ, আপনার শয়নকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে সারারাত পাহারা দিয়েছি।

রাজা : চোপরও উল্লুক! জুতোপেটা করব। পাহারা দিয়েছে! তাহলে কে, কিভাবে এসে আমার দুর্দশা করে দিয়ে গেল? আমার প্রিয়তম গোঁফজোড়ার আধখানা—

[আর বলতে পারলেন না, কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হল]

প্রহরী : মহারাজ, আমার ধারণা এ কোন বাইরের শত্রুর আক্রমণ নয়, এ নিশ্চয়ই গৃহশত্রু বিভীষণের কাণ্ড।

রাজা : গৃহশত্রু? কে সেই গৃহশত্রু?

প্রহরী : আজ্ঞে, ইঁদুর।

রাজা : অসম্ভব!

প্রহরী : আজ্ঞে, ইঁদুরের পক্ষেই এই দুঃসাহসিক ডাকাতি সম্ভব।

রাজা : তাহলে ডাক। এক্ষুনি পাত্রমিত্র, মন্ত্রী, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, জ্যোতিষী, মহাগুপ্তচর, সেনাপতি, সবাইকে ডাক। সকলে যদি বলে তোমার কথা ঠিক, তাহলে ছাড়া পাবে, নইলে তোমার প্রাণদণ্ড!

[প্রস্থান]

[প্রহরী হাউমাউ করে কেঁদে উঠল]

॥ **দৃশ্যান্তর** ॥

[পাত্রমিত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও মহাগুপ্তচর সভায় এসে বসেছেন। সকলেই গম্ভীর। কি জন্যে এই জরুরী সভা? সকলে আকাশ-কুসুম ভাবছেন। এমন সময় মহারাজার প্রবেশ। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। মহারাজার দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠলেন]

রাজা : [ক্রুদ্ধ] হাসবেন না, হাসবেন না। কথায় বলে, কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ! শুনুন আপনারা, অন্যের দুর্গতি দেখে যে হাসে সে অমানুষ। তার শাস্তি প্রাণদণ্ড!

[সকলের মুখমণ্ডল একমুহূর্তে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল]

মন্ত্রী : মহারাজ, আপনার এই গোঁফ-বিয়োগে আমরা পুত্রশোক পেলুম! গোঁফের আত্মার সদ্‌গতি কামনায় আমরা এক মিনিট নীরবতা পালন করব মহারাজ—

রাজা : [উচ্চ কণ্ঠে] চুপ করুন। শোক প্রস্তাব পরে তুলবেন। আগে বলুন, আমার এই দুর্গতি কে করেছে ?

মন্ত্রী : আজ্ঞে মহারাজ, মানুষ অনেক অমানুষিক কাজ করে সত্য, কিন্তু আমার মনে হয় এই গোঁফ-সংহার নাটকের নায়ক কোন মানুষ নয়। এ নিছক ইঁদুরের ইঁদরামি।

রাজা : ইঁদুরের ইঁদরামি।

মন্ত্রী : হাঁ মহারাজ, মানুষের এই গোঁফ বিশেষত কুণ্ডলী পাকানো তা-দেয়া গোঁফের প্রতি ইঁদুরের জন্মগত আকর্ষণ। আর রাজকীয় গোঁফ পেলে তো কথাই নেই। গোঁফের সুমিষ্ট গন্ধে, ইঁদুর মাথা ঠিক রাখতে পারে না, মহারাজ।

রাজা : তাহলে এইসব তস্করদের কঠোর শাস্তি দিতে হয়। কি বলেন আপনারা ?

সভাসদগণ : অবশ্যই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

বিজ্ঞানী : কিন্তু আমার একটু নিবেদন আছে মহারাজ।

রাজা : নির্ভয়ে বলুন।

বিজ্ঞানী : ইঁদুরেই যে এই নারকীয় কাণ্ড করছে, তার প্রমাণ কি ?

রাজা : ঠিকই তো বলেছেন, প্রমাণ কি ? প্রমাণ না পেয়ে শাস্তিদান—

বিজ্ঞানী : অবশ্য প্রমাণ পেতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না মহারাজ।

রাজা : কিভাবে ?

বিজ্ঞানী : আমার ফরেনসিক ল্যাবোরেটরিতে এক্ষুণি পাঠিয়ে দেব আততায়ীর পায়ের ছাপ, আর আপনার ছিন্ন গোঁফের এক দু'গাছি। সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসবে আততায়ীর নাড়ীনক্ষত্র।

রাজা : আমার বিছানায়ই পায়ের ছাপ ও ছিন্ন গোঁফের টুকরো-টাকরা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এই, কে আছিস—[একজন প্রহরী এসে দাঁড়াল] আততায়ীর পায়ের ছাপ ও ছিন্ন গোঁফ নিয়ে এস –[প্রহরীর প্রস্থান]

মন্ত্রী : আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে মহারাজ। এত বড় একটা বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটে গেল, অথচ আমাদের গুপ্তচর বিভাগ আগেভাগে কোন খবরই দিতে পারল না ?

রাজা : আমিও তো তাই ভাবছি মন্ত্রী। আমি কাদের ওপর নির্ভর করে রাজ্য চালাচ্ছি ? এরা দেখছি, আমাকে পথে বসাবে। কৈ, মহাগুপ্তচর—

মহাগুপ্তচর : আজ্ঞা করুন মহারাজ।

রাজা : চোপরও অপদার্থের দল, তোমাদের অকর্মণ্যতার জন্যই আমি আজ গোঁফহারা হলাম।

মহাগুপ্তচর : মহারাজ কাল অধিক রাত পর্যন্ত যে যে গোপন খবর আমার দপ্তরে এসে পৌঁছেছে তাতে গোঁফ আক্রমণের সম্ভাব্য কোন খবরই ছিল না। আমার ধারণা, এই আক্রমণ অপরিকল্পিত ও অতর্কিত।

রাজা : চোপরও, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমার বেতন খেয়ে আমার গোঁফের

খবর রাখবে না—তোমাদের হাতীপোষে আমার লাভ কি ?

মহাগুপ্তচর ঃ আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ।

রাজা ঃ ক্ষমা করলেই কি, আর না করলেই কি, আমার হারানো গোঁফ তো আর ফিরে পাব না ! [করুণকণ্ঠে]

মহাগুপ্তচর ঃ পাবেন না কেন মহারাজ, নিশ্চয়ই পাবেন। গুপ্তচরদের অসাধ্য কিছু নেই। ইঁদুরের পেটের ভেতর থেকে প্রতিটি গোঁফ টেনে বের করে আনবো।

রাজা ঃ হ্যাঁ, তাই কর। তোমাদের ওপর নির্ভর করেই তো আমি সশরীরে বেঁচে আছি মহাগুপ্তচর, আমার রাজত্বও টিকে আছে তোমাদেরই জন্য। অথচ তোমরা যদি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও, তাহলে আজ আমার গোঁফ গেছে, কাল মন্ত্রীর গোঁফ যাবে, পরশু সেনাপতির গোঁফ যাবে, তরশু সভাসদ পাত্রমিত্র প্রজা-সাধারণের গোঁফ যাবে [সকলে নিজনিজ গোঁফে হাত দিয়ে দেখে নিল গোঁফ ঠিক আছে কিনা] শেষ অব্দি, রাজ্যটা কি গোঁফ বিহীন প্রমীলা রাজ্যে পরিণত হবে না কি ?

[এমন সময় প্রহরী রাজার দু'তিনটি ছিন্ন গোঁফ নিয়ে এল]

রাজা ঃ কি সংবাদ প্রহরী ?

প্রহরী ঃ সংবাদ শুভ মহারাজ।

রাজা ঃ চোপরও—আমার গোঁফ গেছে বলছ, সংবাদ শুভ।

প্রহরী ঃ না মহারাজ সংবাদ অশুভ। দু'তিনটি ছিন্ন গোঁফ আপনার বিছানায় খুঁজে পেয়েছি।

রাজা ঃ কৈ দেখি, দেখি ! [গোঁফ ক'টি হাতে নিলেন] হায়রে গোঁফ, এই ছিল তোমার মনে ! কত আদর, কত যত্ন করে কত গন্ধ আতর খাইয়ে তোমায় ইয়া করে গড়ে তুলে-ছিলুম ; গত রাতেও তুমি আমার মুখের শোভা বর্দ্ধন করতে ! আজ তুমি কোথায় গোঁফ ! [গলা ভারি হয়ে গেল] গোঁফ, তুমি কি নিষ্ঠুর ! কি অকৃতজ্ঞ ! অহো হো, এই ছিন্ন গোঁফ দেখে আমার গোঁফ-শোক দ্বিগুণ জ্বলছে। [শোকে অভিভূত হলেন] অহো ! আমার মুখের কি গতি হবে ! [কাঁদতে লাগলেন] [সভায় হায় ! হায় ! শব্দ উত্থিত হলো]

মন্ত্রী ঃ বিজ্ঞানী, আপনি মহারাজার হাত থেকে গোঁফগুলো সরিয়ে নিন। নইলে গোঁফের শোকে মহারাজ অচৈতন্য হয়ে পড়তে পারেন।

[বিজ্ঞানী তাড়াতাড়ি মহারাজের হাত থেকে ছিন্ন গোঁফগুলো নিয়ে গেলেন]

রাজা ঃ [কাতর কণ্ঠে] আর এক চোখ দেখতে দাও—আর এক চোখ দেখতে দাও—

পণ্ডিত ঃ মহারাজ, শান্ত হোন। শাস্ত্রে বলেছে, গতস্য শোচনা নাস্তি। যে জিনিস গেছে, তার জন্য শোক করে লাভ নেই। আপনি শান্ত হোন মহারাজ ! আপনার এই প্রবল শোক দেখে, আমরাও চোখের জল ঠেকাতে পারছি না। দেখুন মহারাজ সকলের চোখে জলের ধারা।

রাজা ঃ না পণ্ডিত, এই আমি শান্ত হলুম। আমি রাজা, আমার এত শোক সাজে না।

বিজ্ঞানী ঃ আজ্ঞা করুন মহারাজ, আমি যাই। আততায়ীর সন্ধান এক্ষুণি বের করে নিয়ে আসি।

রাজা : হ্যাঁ যাও-যাও। আততায়ীর সঠিক খবর জানার জন্য আমার প্রাণ ছটফট ছটফট করছে।

বিজ্ঞানী : যাচ্ছি মহারাজ। [প্রস্থান]

রাজা : মন্ত্রী, এখন আপনারা আমাকে সদুপদেশ দিন। গোঁফের বাকী অর্ধাংশ নিয়ে আমি কি করব ? যেম্নি আছে, তেম্নি থাকবে ? নাকি, ক্ষৌরকারকে ডেকে বাকীটা সাফ করে ফেলব ?

মন্ত্রী : মহারাজ, ইঁদুরের ওপর রাগ করে যদি আপনি বাকী গোঁফগুলো সংহার করেন, তাহলে অধর্ম হবে।

রাজা : গোঁফ-সংহারে অধর্ম ? কেন ?

মন্ত্রী : মহারাজ, এই গোঁফনিচয় আপনার আশ্রিত। আপনাকে আশ্রয় করে ওরা বেড়ে ওঠেছে, সুখে শান্তিতে আছে। পুত্রবৎ স্নেহে আপনি এদের লালন পালন করেছেন। এতকাল প্রতিপালন করে, আজ যদি নির্দয়ভাবে এদের পরিত্যাগ করেন, তাহলে আপনার অধর্ম হবে মহারাজ। আশ্রিত ও পালিতকে রক্ষা করাই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

রাজা : কিন্তু মন্ত্রী, মুখের একদিকে গোঁফ -- একদিকে ন্যাড়া ! চেহারাটা কিম্ভুতকিমাকার লাগবে না ? রানীর সামনে গিয়েই বা দাঁড়াব কি করে ?

মন্ত্রী : মহারাজ, মানুষ অভ্যাসের দাস। দু' চারদিন আপনার এই কিম্ভুতকিমাকার রূপ দেখে একটু হয়ত লুকিয়ে চুরিয়ে ফিক্‌ফাক্‌ হাসবে, কিন্তু দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, আর হাসাহাসি করবে না। ভাববে, রাজার আসল চেহারাই এই।

পণ্ডিত : তাছাড়া মহারাজ, শাস্ত্রে বলেছে, সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতে পণ্ডিতাঃ। অর্থাৎ কিনা, সর্বনাশ উপস্থিত হলে জ্ঞানিগণ অর্ধেক ত্যাগ করেন।

রাজা : আমার তো সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছেই পণ্ডিত।

পণ্ডিত : কিন্তু, আপনি তো মহারাজ, গোঁফের অর্ধেক আগেভাগেই ইঁদুরের উদরে ত্যাগ করে বসে আছেন। পূর্ণত্যাগের কথা তো শাস্ত্রে বলে নি।

মন্ত্রী : মহারাজকে অবশ্য উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। তবে মহারাজার এই দুর্দিনে আমরা ছাড়া আর কে সৎবুদ্ধি দেবে, সৎপরামর্শ দেবে। তাই বলি মহারাজ, জীবন্ত গোঁফদের কচুকাটা করবেন না। অধর্ম হতেই পারে।

রাজা : তাহলে, এই চেহারা নিয়েই চলাফেরা করতে হবে ? লজ্জা লাগবে না ?

মন্ত্রী : পুরুষদের লজ্জা কি মহারাজ ! লজ্জা তো নারীর ভূষণ। তবে, এতই যদি লজ্জা লজ্জা ভাব আপনার মনে উদয় হয়, তাহলে, যে কটা দিন গোঁফের মরুভূমি অংশে নতুন গোঁফ না গজায়, ততদিন হাত দিয়ে ন্যাড়া স্থানটি একটু ঢেকে ঢুকে রাখবেন আর কি ! দাঁত না থাকলে লোকে যেমনটি করে থাকে।

রাজা : এটা তো কোনো কঠিন কাজ নয়। তা করা যাবে।

মন্ত্রী : তাছাড়া, ক'দিনই বা লাগবে নতুন গোঁফ গজাতে। আজকাল তো দেখছি, ক্ষেতেজমিতে কলের সারটার দিয়ে ছ'মাসের ধান, দু'মাসে ফলায়। বলতে গেলে, গোঁফ ক্ষেতে আর ধান

ক্ষেতে এমন কি তফাৎ ? রাজবৈদ্যকে জিগ্যেস করুন মহারাজ, গোঁফের তর তর বৃদ্ধির জন্য কোন নতুন সারটারের আবিষ্কার ইতিমধ্যে হয়েছে কিনা।

রাজা : উত্তম প্রস্তাব। রাজবৈদ্য—

রাজবৈদ্য : আজ্ঞা করুন মহারাজ—

রাজা : অতিদ্রুত গোঁফ বৃদ্ধির ব্যবস্থা কি আপনাদের শাস্ত্রে আছে ?

রাজবৈদ্য : আলবৎ আছে মহারাজ ! আয়ুর্বেদকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেই তো আমরা আজ রোগের পরমাত্মীয়। গোঁফ বৃদ্ধির জন্য আয়ুর্বেদে এক-প্রকার জৈব সারের ব্যবস্থা আছে মহারাজ।

রাজা : জৈব সার ?

রাজবৈদ্য : হ্যাঁ মহারাজ, শুনুন বলছি। প্রথমে, কচি ষাঁড়ের গোবর দিয়ে ঘুঁটে প্রস্তুত করতে হবে। ঘুঁটে প্রস্তুত করার সময় গোবরের সঙ্গে তিন তোলা করে পটপটি চূর্ণ, তিলের রস ও খাঁটি গব্যঘৃত মেশাতে হবে। তারপর ঐ ঘুঁটে ৩২ দণ্ড, ৩২ পল, ৩২ অনুপল ও ৩২ বিপল কাল সময় অপরাহ্ন-রৌদ্রে শুকাতে হবে। ঘুঁটে শুকালে তা ৮ প্রহর আতপ ধানের তুষের আগুনে পোড়াতে হবে। ঐ ঘুঁটের ছাই গোঁফহীন স্থানে প্রত্যহ ৩ দণ্ডকাল ঘষুন, দেখবেন মহারাজ, সাতদিনে আপনার মুখ-সাগরে গোঁফের ঢেউ খেলছে।

রাজা : অবিলম্বে এই অষুধ আপনি প্রস্তুত করুন রাজবৈদ্য।

রাজবৈদ্য : এর জন্যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন মহারাজ।

রাজা : কত মুদ্রা প্রয়োজন ?

রাজবৈদ্য : বেশি নয়, আপাতত সহস্রমুদ্রা হলেই চলবে।

রাজা : আমি সহস্রমুদ্রা মঞ্জুর করলাম। আপনি কোষাগার থেকে নিয়ে যান।

রাজবৈদ্য : আমি সাতদিনের মধ্যেই এই গোঁফ-সার প্রস্তুত করে আনব মহারাজ।

[এমন সময় চেঁচাতে চেঁচাতে বিজ্ঞানীর প্রবেশ]

বিজ্ঞানী : ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে, আততায়ী ধরা পড়েছে। একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়েছে মহারাজ !

রাজা : [উৎফুল্ল] ধরা পড়েছে ? কৈ, কৈ সেই দুর্বৃত্ত পামর ?

বিজ্ঞানী : এই তো, এই দেখুন মহারাজ, এই রিপোর্টে সব লেখা আছে।

রাজা : [নিরুৎসাহ] ও, তোমার কাগজে ধরা পড়েছে ? নাও, পড়ে শোনাও—

বিজ্ঞানী : মহারাজ দুষ্কৃতিকারী এক ছিঁচকে নেংটি ইঁদুর।

সকলে : এ্যা নেংটি ইঁদুরের কাণ্ড !

রাজা : উঃ, অসহ্য ! ধাড়ি ইঁদুর হলে তবু সম্মানটা কিছুটা বাঁচত। নেংটি ইঁদুরে, আমার গোঁফ খেয়ে গেল ! মান সম্মান সব রসাতলে গেল দেখছি।

বিজ্ঞানী : এর দেহের ও মনের যাবতীয় বিবরণ লেখা আছে রিপোর্টে। উচ্চতা দেড় ইঞ্চি, সলেজ দৈর্ঘ আট ইঞ্চি, গোঁফ-খেকো দাঁত সর্ব-সাকুল্যে চব্বিশটি। গায়ের রং আষাঢ়ের মেঘের মত। গোঁফ, বিশেষত রাজ-গোঁফ এর অতীব প্রিয় খাদ্য। স্বভাব স্বাভাবিকভাবে শান্ত, কিন্তু গোঁফ ভক্ষণের সময় দারুণ অশান্ত।

রাজা ঃ আর শুনতে চাই নে। এই অপমান আর সহ্য করা যায় না। সেনাপতি—

সেনাপতি ঃ আদেশ করুন মহারাজ—

রাজা : এক্ষুণি সসৈন্যে সেই নরাধমকে বধ করবার জন্য যাত্রা কর।

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, পশুকুলের মধ্যে ইঁদুর বুদ্ধি ও বলে শ্রেষ্ঠ।

রাজা ঃ কি রকম?

মন্ত্রী ঃ ইঁদুর অবশ্যই বলশালী, নইলে সিদ্ধিদাতার মত বিরাশী ওজনের বপুখানি সে অক্লেশে বহন করে কিভাবে?

সকলে ঃ যথার্থ! যথার্থ!

মন্ত্রী ঃ ইঁদুর অতীব বুদ্ধিমান! চতুর চূড়ামণি। নইলে, সে নিজে কোন ফল ফসল উৎপন্ন করে না, কোন পরিশ্রম করে না, অথচ তার খাদ্যের অভাব হয় না কেন? সে সুচতুর, তাই পরের শস্যে, পরের গোঁফে দিব্যি জীবনযাপন করে।

পণ্ডিত ঃ শাস্ত্রে বলেছে, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। বুদ্ধি যার বল তার। কিন্তু ইঁদুরে দেখছি, বুদ্ধি ও বলের এক দেবদুর্লভ সমন্বয় ঘটেছে।

মন্ত্রী ঃ তাই বলছিলাম মহারাজ, ইঁদুরদের আচরণ; গতাগতি, রণকৌশল ইত্যাদি ভালভাবে না জেনে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করা উচিত হবে না।

রাজা ঃ কিন্তু কিভাবে জানব ইঁদুরের তত্ত্ব?

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, আমি প্রস্তাব করছি, ইঁদুর অভিযান বিষয়ে আপনাকে উপযুক্ত পরামর্শ-দানের জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করুন। ঐ কমিটি ইঁদুরের যাবতীয় তত্ত্বতথ্য সংগ্রহ করে সাতদিনের মধ্যে আপনার কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে আপনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবেন।

রাজা ঃ উত্তম প্রস্তাব। আপনারা সকলেই কি তা সমর্থন করেন?

সকলে ঃ আমরা কায়মনোবাক্যে তা সমর্থন করি।

রাজা ঃ তাহলে আমি ঘোষণা করছি, মন্ত্রী, সেনাপতি, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও মহাগুপ্তচরকে নিয়ে ইঁদুর বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হল। ঐ কমিটির সভাপতি হবেন স্বয়ং মন্ত্রীবাহাদুর।

সকলে ঃ জয় মহারাজার জয়! জয় মহারাজার জয়!

মন্ত্রী ঃ কিন্তু মহারাজ, এই কমিটির কার্য পরি-চালনার জন্য সামান্য অর্থের প্রয়োজন হবে।

রাজা ঃ অবশ্য অবশ্য! আমি এই কমিটির ব্যয় বাবদ লক্ষমুদ্রা মঞ্জুর করলুম। কিন্তু মন্ত্রী এই দীর্ঘ সাতটি দিন আমি কি ভাবে কাটাব? না গজাবে গোঁফ, না পারব চরম শত্রুকে শাস্তি দিতে! যন্ত্রণা হবে না মনে?

পণ্ডিত ঃ এই সাতদিনের ব্যবস্থাপত্র শাস্ত্রেই দেয়া আছে মহারাজ! এই সাতদিন আপনি পরলোকগত গোঁফের জন্য অশৌচ পালন করবেন।

রাজা ঃ অশৌচ পালন? গোঁফের জন্য?

পণ্ডিত ঃ হ্যাঁ মহারাজ, এ অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা। গোঁফ আপনার দেহেরই অংশ। আপনার দেহ বিনষ্ট হলে আমরা তেরদিন অশৌচ পালন করব, আর দেহাংশ বিনষ্ট হলে সাতদিনও করব না? এটা কি হয় মহারাজ?

রাজা ঃ ঠিকই তো বলেছেন পণ্ডিত !

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, শুধু আপনি একা-ই অশৌচ পালন করবেন কেন ? আমি প্রস্তাব করছি, এই সাতদিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হোক। মহারাজ, আপনি অনুমতি করুন, ঢোল পিটিয়ে রাজ্যের সর্বত্র রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কথা ঘোষণা করি।

সকলে ঃ সাধু! সাধু!

রাজা ঃ অহো! আমার প্রতি আপনাদের কি শ্রদ্ধা, কি ভালোবাসা! আমার ব্যক্তিগত গোঁফের শোককে যেভাবে আপনারা আপন করে নিয়েছেন, তাতে আমি ধন্য, আমি ধন্য!

মন্ত্রী ঃ তাহলে, রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা দেয়া হোক। কি ঘোষণা দেওয়া হবে পণ্ডিত ? বয়ানটা কি হবে ?

পণ্ডিত ঃ ঘোষণাটি এই হতে পারে, মহারাজাধিরাজ লক্ষ লক্ষ শ্রীযুত আজবপুরাধিপতির গোঁফ চুরির কারণে—

মন্ত্রী ঃ না পণ্ডিত, এতো চুরি নয়। আর চুরির কারণে কি রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা চলে ?

পণ্ডিত ঃ রাজবাড়িতে চুরির কারণে অবশ্য রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা যেতে পারে, তবে আপনার যখন আপত্তি, চুরির কারণে না বলে ডাকাতির কারণে বলা হোক।

মন্ত্রী ঃ না ডাকাতির কারণেও রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা ঠিক হবে না। সমালোচনা হবে।

মহাগুপ্তচর ঃ তাহলে সত্য কথাই ঘোষণা করুন, গোঁফের মৃত্যুর জন্য—

বিজ্ঞানী ঃ না না, এ কি করে হয় ? মৃত্যু হল দেহের স্বাভাবিক পরিণতি। মহারাজের গোঁফের তো স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয় নি! ইঁদুরে কেটে নিয়েছে।

পণ্ডিত ঃ অর্থাৎ, অপমৃত্যু!

সকলে ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, অপমৃত্যু!

রাজা ঃ বাঃ, পণ্ডিত মশাইয়ের কি অপূর্ব শব্দজ্ঞান! আপনাকে আমি 'আজবরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করব।

সকলে ঃ সাধু! সাধু!

মন্ত্রী ঃ তাহলে এই ঘোষণা করতে হবে যে, মহারাজাধিরাজ লক্ষ লক্ষ শ্রীযুত আজবপুরাধিপতির অর্ধ-গোঁফের অপমৃত্যুর কারণে সাতদিবস মহাসমারোহে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে।

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে ঢোলের বাদ্যসহ ঘোষণাটিকে উচ্চকণ্ঠে বলতে শোনা যাবে]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[রাজা ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ]

রাজা ঃ সাতদিন তো হয়ে গেল। আপনাদের রিপোর্ট কি প্রস্তুত মন্ত্রীবর ?

মন্ত্রী ঃ আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, বহু পরিশ্রম, বহু ঘোরাঘুরি, বহু অনুসন্ধান, বহু সাক্ষ্য, বহু আলোচনা, বহু গোপন অভিযান, এক কথায় অনেক বহু করার পর আমরা এই রিপোর্ট তৈরী করেছি মহারাজ।

রাজা ঃ তাহলে বলুন মন্ত্রীবর, আমার গোঁফনিধনের কারণ কি ?

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, ইঁদুরকুল নানাকারণে আপনার প্রতি ত্যক্তবিরক্ত।

রাজা ঃ কেন মন্ত্রী কেন ? আমি তো ইঁদুরদের

সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, তবে এরা কেন আমার প্রতি বিরক্ত ?

পণ্ডিত : মহারাজ, ইঁদুরদের গোঁফ আক্রমণের প্রধান কারণ এদের দারুণ খাদ্যাভাব। এবার রাজ্যে খরার কারণে দুর্ভিক্ষ চলছে। প্রজারা ধান, চাল, ডাল, শাকসব্জী ইত্যাদি খুব সাবধানে রাখে। এক কণা খাদ্যও ইঁদুরের পেটে যাবার জো নেই। বাধ্য হয়েই তারা গোঁফ অভিযান সুরু করেছে।

রাজা : তা—রাজ্যে এত গোঁফ থাকতে আমার গোঁফের প্রতি এদের এত অনুরাগ কেন ?

বিজ্ঞানী : মহারাজ, আপনি প্রজাপালক। আমরা যেমন আপনার প্রজা, এ রাজ্যের ইঁদুর-কুলও আপনার প্রজা। প্রজা পালন রাজার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু মহারাজ আপনি ইঁদুর-প্রজার প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করছেন না। এদের জন্য খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করছেন না। তাই ওরা এই নষ্টামি সুরু করেছে।

মন্ত্রী : আমি আরও জেনেছি মহারাজ, জন-গোঁফের চাইতে রাজ-গোঁফ নাকি স্বাদে বর্ণে গন্ধে অতুলনীয়। এজন্যেই আপনার গোঁফের প্রতি—

মহাগুপ্তচর : শুধু আপনার গোঁফই নয় মহারাজ। সাক্ষ্যপ্রমাণে জেনেছি, রাজ্যের শত শত গোঁফ কেশ ইতিমধ্যে ইঁদুরের উদরে চলে গেছে। কয়েকজন গোঁফ-কেশহারা সাক্ষী মহারাজার কাছে নালিশ জানাতে এখানে হাজির হয়েছে। নিজের কানেই সেই দুর্ভাগাদের করুণ কাহিনী শুনুন মহারাজ।

রাজা : না না, আপনার রিপোর্টই যথেষ্ট। ওই সব হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনলে আমার গোঁফ-শোকের আগুন আবার নতুন করে জ্বলে ওঠবে।

মন্ত্রী : তবুও প্রজাদের দুঃখের কথা আপনার শোনা কর্তব্য মহারাজ !

রাজা : তাহলে ডাকুন—

[চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একটি তরুণীর প্রবেশ]

রাজা : ওকি, তোমার তো গোঁফ নেই, তুমি কাঁদছ কেন ? তোমার আবার কি হলো ?

[মহারাজার কথা শুনে তরুণী আরও জোরে কাঁদতে লাগল]

তরুণী : মহারাজ, আমি আজ সর্বস্বান্ত।

রাজা : মন্ত্রীবর, ও তো সর্বস্বান্ত। গোঁফ-কেশ তো হারায় নি। ওকে সাক্ষ্য হিসেবে এনেছেন কেন ?

তরুণী : [কাঁদতে কাঁদতে] মহারাজ, আমি গোঁফহারা নই, কিন্তু কেশ হারা, কেশই ছিল আমার সর্বস্ব। আজ আমার সব শেষ ! আমার কেশ—[কান্নার চোটে আর বলতে পারে না]

রাজা : অহো, আর সহ্য করতে পারছি না ! বুঝতে পারছি মা, আমার গোঁফ আর তোমার কেশ এক পথেই গেছে। কান্না থামাও মা, কান্না থামাও। আমি নিজেও তো আমার কান্না চেপে রেখেছি এই বুকে।

তরুণী : মহারাজ, আপনার গোঁফ আর কি সুন্দর ছিল ? কত লম্বাই বা ছিল ? আমার চুল ছিল মেঘবরণ, নীলসাগরের ঢেউ-এর মত পিঠ বেয়ে হাঁটুর নিচে গড়িয়ে পড়ত। মা কালীর

চুল কোথায় লাগে ! আর এখন ; অহো-হো— [কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল]

রাজা : শোক সংবরণ কর মা, শোক সংবরণ কর। তোমার কেশ হারানোর দুঃখ দেখে, আমার গোঁফ-হারানোর দুঃখ জেগে ওঠেছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। [কণ্ঠ রুদ্ধ]

তরুণী : মহারাজ, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব ? যখনই আমার চোখে আমার চুলগুলোর ছবি ভেসে পঠে, আমি স্থির থাকতে পারি না ! মনে হয়, আত্মহত্যা করি, গলায় ফাঁস লাগাই, নদীতে ঝাঁপ দিই, রেলগাড়ির তলায় মাথা দিই [কান্না]

রাজা : যা অবশিষ্ট আছে, তা নিয়েই ধৈর্য ধরে বেঁচে থাক মা ! আমিও তো অর্ধেক গোঁফ নিয়েই বেঁচে আছি।

তরুণী : বিচার করুন মহারাজ, এই নৃশংস কেশ-হত্যার বিচার করুন।

রাজা : এই অত্যাচারের কঠোর বিচার করব। তুমিও দ্রৌপদীর মত প্রতিজ্ঞা কর মা, যতদিন এই অন্যায়ের শাস্তি না হবে, ততদিন আর কেশ-বন্ধন করবে না।

তরুণী : মহারাজ, আমার কেশ আর কোথায় যে বন্ধন করব ? অহো-হো—[ডুকরে কেঁদে ওঠল]

রাজা : তুমি আর কেঁদো না মা। ঘরে যাও। আমি এক্ষুণি সেই কেশ-খাদকদের ধরে আনছি। সেনাপতি—

সেনাপতি : আজ্ঞা করুন মহারাজ—

রাজা : এই মুহূর্তে রাজ্যের সব সৈন্য নিয়ে ইঁদুর অভিযান সুরু করুন। আগামী কালের মধ্যে নেংটি থেকে ধাড়ি পর্যন্ত সব 'ইঁদুরদের বন্দী করা চাই-ই চাই—[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে রণদামামা বেজে ওঠল]

॥ **দৃশ্যান্তর** ॥

[রাজা ও সেনাপতি]

রাজা : কি সংবাদ সেনাপতি ? শত্রুদের বন্দী করা হয়েছে ?

সেনাপতি : [মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল]

রাজা : কি ? কথা বলছ না যে ? ইঁদুরদের বন্দী করা হয়েছে ?

সেনাপতি : ক্ষমা করুন মহারাজ, এক ইঁদুরকেও বন্দী করতে পারিনি।

রাজা : [ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন] কি বললে ? এত বড় সেনাবাহিনী নিয়ে ওই কড়ে আঙ্গুলের মত নেংটি ইঁদুরদের একটিকেও বন্দী করতে পারনি ? বলিহারী যাই তোমাদের বীরত্বের ? অপদার্থ সব ! তোমাদের—তোমাদের আমি বরখাস্ত করব—

সেনাপতি : মহারাজ, আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমাদের এই অভিযানের খবর কে বা কারা আগেই ফাঁস করে দিয়েছে।

রাজা : কে, কে ফাঁস করল এই খবর ?

সেনাপতি : আমার মনে হয় মহারাজ, ইঁদুরদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে, আমাদের মধ্যে কেউ এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আগেভাগে অভি-যানের খবর পেয়ে ইঁদুরেরা মাটির নিচে গভীর গর্তে আত্মগোপন করেছে। তাই তো, এত সৈন্য-সামন্ত নিয়েও ইঁদুরদের টিকিটিও দেখতে পেলাম না।

রাজা : বিশ্বাসঘাতকে দেশটা ছেয়ে গেছে। আমি কঠোর শাস্তি দেব। কে আছিস? উপদেষ্টা কমিটিকে ডাক—

[উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের প্রবেশ]

রাজা : মন্ত্রী, আশা করি শুনেছেন আমাদের ব্যর্থ অভিযানের কথা। ছিঃ ছিঃ, আমি লজ্জায় মরে যাই। পৃথিবীর লোক বলবে কি?

মন্ত্রী : আমরা ঢোল পিটিয়ে দেব মহারাজ, এই ব্যর্থ অভিযানের কথা কেউ যেন বলাবলি না করে।

রাজা : কিন্তু এখন কি কর্তব্য মন্ত্রী? ইঁদুরদের শায়েস্তা করার পথ কি? আপনারা আমাকে উপদেশ দিন।

মন্ত্রী : মহারাজ, ইঁদুররা যে শুধু আমাদের গোঁফ-কেশ হরণ করছে তা নয়, আমাদের আহার নিদ্রাও হরণ করেছে।

রাজা : এ্যাঁ, আবার নতুন করে আহার নিদ্রার ওপরেও আক্রমণ সুরু করেছে? উঃ এদের ঔদ্ধত্য অসহ্য!

মন্ত্রী : না। মানে, মহারাজ—ইঁদুরদের চিন্তায়ই তো দিনরাত কাটছে। খাওয়া ছেড়েছি, ঘুম ছেড়েছি– তাই বলছিলুম, ইঁদুররা আহার নিদ্রাও হরণ করেছে।

রাজা : সেই কথা! যাক্ বাবা। বাঁচা গেল। বলুন এখন কর্তব্য কি?

পণ্ডিত : মহারাজ, আমার মনে হয়, ইঁদুরদের সঙ্গে রণকৌশলে আমরা পেরে উঠব না। ওরা গেরিলা যুদ্ধে দক্ষ। আমাদের দেখতে পেলেই তরতর তরতর করে গভীর গর্তে প্রবেশ করে, আর গোঁফে তা দিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। তাই বলছিলাম কি মহারাজ ওদের সঙ্গে একটা অনাক্রমণ চুক্তি করলে ভাল হয় না?

মন্ত্রী : না না, এতে মহারাজার নিন্দে হবে কলংক হবে। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করা যায়। মহারাজ আর ইঁদুর কি সমান? মহারাজ আমি ইঁদুর নিধন যজ্ঞের একটা খাসা পরিকল্পনা করেছি।

রাজা : বলুন—

মন্ত্রী : রাজ্যের সব মাটি খুঁড়ে ফেলা হোক। ইঁদুরের বাপের সাধ্য কি আর লুকিয়ে থাকে। লেজ ধরে টেনে টেনে বার করব। মানুষের সঙ্গে চালাকি! আদেশ দিন মহারাজ, আজই হাজার হাজার শ্রমিক কোদাল শাবল গাঁইতি নিয়ে কোমর কষে লেগে যাক্—

সকলে : উত্তম! উত্তম!

সেনাপতি : কিন্তু মন্ত্রীমশাই, আগের মত মাটি খোঁড়ার খবরও যদি ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে ইঁদুররা নতুন নতুন সুড়ঙ্গপথ তৈরী করে কোথা থেকে কোথা চলে যাবে, টেরটিও পাবেন না।

মহাগুপ্তচর : ঠিক বলেছেন সেনাপতি মশাই। এসব গুপ্তকথা আগেভাগে জানাজানি হয়ে যায় বলেই আমার দপ্তর ইঁদুরদের গতিবিধির ঠিক ঠিক খবর রাখতে পারছে না। তাই বলি মহারাজ, সারা রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে দেয়া হোক, এই মৃত্তিকা খননের খবর যে ফাঁস করবে, তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।

সকলে : উত্তম! উত্তম!

রাজা : আমি এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। তাহলে আজ থেকেই কাজ শুরু হোক—

মন্ত্রী : মহারাজ, এই গুরুতর কাজের জন্য কমপক্ষে কোটি মুদ্রার প্রয়োজন।

রাজা ঃ আমি কোটি মুদ্রা মঞ্জুর করলাম। দেখি এবার, রে চতুর মুষিক। কত শক্তি ধর তুমি দেহে! আমি আদেশ দিচ্ছি। এক্ষুণি মাটি খোঁড়ার অভিযান সুরু হোক—

[সঙ্গে সঙ্গে কোদাল গাঁইতি শাবল হাতে গান গাইতে গাইতে শ্রমিক দলের প্রবেশ]

গান

খোঁড় মাটি খোঁড় মাটি চালাও জোর শাবল।
নেংটি ইঁদুর, ধাড়ি ইঁদুর যাবি কোথায় বল্ ॥
গোঁফ খেয়েছিস মহারাজার
চক্ষে মোদের জলেরই ধার
কে করিবে এবার নিস্তার
পাবেই প্রতিফল ॥
কুটুস কুটুস কাটবি কি আর
পাঠাবো রে যমের দুয়ার
গণেশ বাবার ধারি না ধার
মারব ওরে খল ॥

॥ **দৃশ্যান্তর** ॥

স্থান ঃ রাজসভা

[রাজা ও মন্ত্রী]

রাজা ঃ [তুষ্ট মনে] রোজ কত ইঁদুর কাটা পড়ছে, কতই বা ধরা পড়ছে, তার জমা খরচ রাখছেন তো মন্ত্রীবর ?

মন্ত্রী ঃ সে সব ঠিক আছে মহারাজ। এবার আর চালাকি খাটবে না। যাকে বলে পুকুর-খোঁড়া আক্রমণ। পালাতে চাইলেও সব দুয়ার বন্ধ। বাছাধনদের এবার জলে ডুবে দম বন্ধ হয়ে পচে গলে মরতে হবে।

রাজা ঃ [খুশি হয়ে] কি দারুণ বুদ্ধির খেল্‌টাই না দেখালেন মন্ত্রীবর! শয়তানদের একেবারে সলিল সমাধি! হাঃ হাঃ হাঃ, এবার আমার গোঁফ হারানোর ব্যথার কিছু উপশম হবে মন্ত্রী, কিছু স্বস্তি পাবো। [হঠাৎ শরীরটা কেঁপে ওঠল] [চিৎকার দিয়ে] মন্ত্রী, কি হলো? মাথা ঘুরছে। পায়ের নিচে মাটি টলছে— মন্ত্রী—

মন্ত্রী ঃ মহারাজ, ভূমিকম্প! আমি দাঁড়াতে পারছি না। শরীর টলছে। মহারাজ—[চিৎকার দিয়ে মহারাজকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল]

রাজা ঃ মন্ত্রী—[মন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন]

মন্ত্রী ঃ মহারাজ—

[কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরে ভয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। হঠাৎ নেপথ্যে তুমুল হৈ চৈ শোনা গেল। রাজা মন্ত্রীকে ছেড়ে দিলেন]

রাজা ঃ ওকি ? কি হলো ? কিসের হৈ চৈ।

মন্ত্রী ঃ উঃ! কি জোরে মাটি কেঁপে উঠল! আর একটু হলে মরেই গেছলাম আর কি!

রাজা ঃ রাখুন আপনার মরা! হৈ চৈ শুনছেন ? [ভয় পেলেন]

মন্ত্রী ঃ ও কিছু নয় মহারাজ, আনন্দের হৈ চৈ। ইঁদুর বধের আনন্দ।

রাজা ঃ না না মন্ত্রী, কারা যেন ক্রুদ্ধ চিৎকার করতে করতে এদিকে আসছে।

[দৌড়ে প্রহরীর প্রবেশ]

রাজা : কি হয়েছে প্রহরী ? কি সংবাদ ?

প্রহরী : মহারাজ, সব্বোনাশ। প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে। পাগলা কুকুরের মত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেছে। রাজবাড়ীর দিকেই সব ছুটে আসছে।

রাজা : কেন, কেন ? আমি কি দোষ করেছি ?

প্রহরী : মহারাজ, প্রচুর মাটি খোঁড়ার ফলে বড় বড় ধ্বস নামছে। ভূমিকম্প হচ্ছে। বহু প্রজা মাটি চাপা পড়ছে। প্রজাদের ঘরবাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে মাটির নিচে। মহাবিপদ মহারাজ, মহাবিপদ ! [প্রস্থান]

রাজা : এখন আমি কি করি, মন্ত্রী, এখন কি করি ? উপদেষ্টা কমিটি কৈ ? ওদের ডাকুন। এখন আমাকে সদুপদেশ দিন। কি করতে হবে বলুন ? [অস্থির হয়ে ওঠলেন]

মন্ত্রী : মহারাজ, এই বিশৃঙ্খলায় উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা কে কোন্ দিকে গেছে খুঁজে পাবো না। আমি তো রয়েছি মহারাজ। উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসেবে বলছি, এখন পলায়নই আপনার বাঁচার একমাত্র পথ।

রাজা : [আঁৎকে উঠে] পলায়ন ! ইঁদুরের ভয়ে পলায়ন !

মন্ত্রী : ইঁদুরের ভয়ে নয় মহারাজ, মানুষের ভয়ে। দেরী করবেন না মহারাজ, পলায়ন করুন।

রাজা : আপনারা কি উপদেশ দিলেন মন্ত্রী ! আমার এভাবে ভরাডুবি হলো !

মন্ত্রী : আমরা সৎ-উপদেশই দিয়েছি মহারাজ, আসলে, ইঁদুরের অভিশাপেই এই বিপর্যয়।

রাজা : ইঁদুর কখনও অভিশাপ দিতে পারে ?

মন্ত্রী : পারে মহারাজ পারে। হাজার হোক ইঁদুর তো দেবতা ?

রাজা : ইঁদুর দেবতা ?

মন্ত্রী : দেবতা নয় তো কি ? স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন। আমার মনে হয়, গণেশের কোপ পড়েছে রাজ্যের ওপর [নেপথ্যে গোলমাল শোনা গেল] মহারাজ। আর কথা নয়। এখন পালান !

রাজা : মন্ত্রী, রাজত্বটা যাতে না যায় একবার শেষ চেষ্টা করলে হয় না ? ঘটা করে ইঁদুর দেবতার পূজোর ব্যবস্থা করুন। ইঁদুরের কাছে ক্ষমা চাইব। তাহলে হয়ত রাজাগিরিটা বেঁচে যেতে পারে।

মন্ত্রী : মহারাজ, ইঁদুর তুষ্ট হলেও, প্রজারা রুষ্ট। এক দেবতার হাত থেকে বাঁচলেও আর এক দেবতার হাতে নিস্তার নেই। পলায়ন করুন মহারাজ, ভাগ্যে থাকলে আবার রাজ্য ফিরে পাবেন। [কোলাহল খুব কাছে শোনা গেল] ঐ যে, এসে পড়ল। আর দেরী করবেন না মহারাজ ! আমিও যাই— [বেগে প্রস্থান]

রাজা : এ্যাঁ, মন্ত্রী আমাকে ফেলে চলে গেল ? রানী-রানী কোথায় তুমি ? এসো আমরাও পালাই।

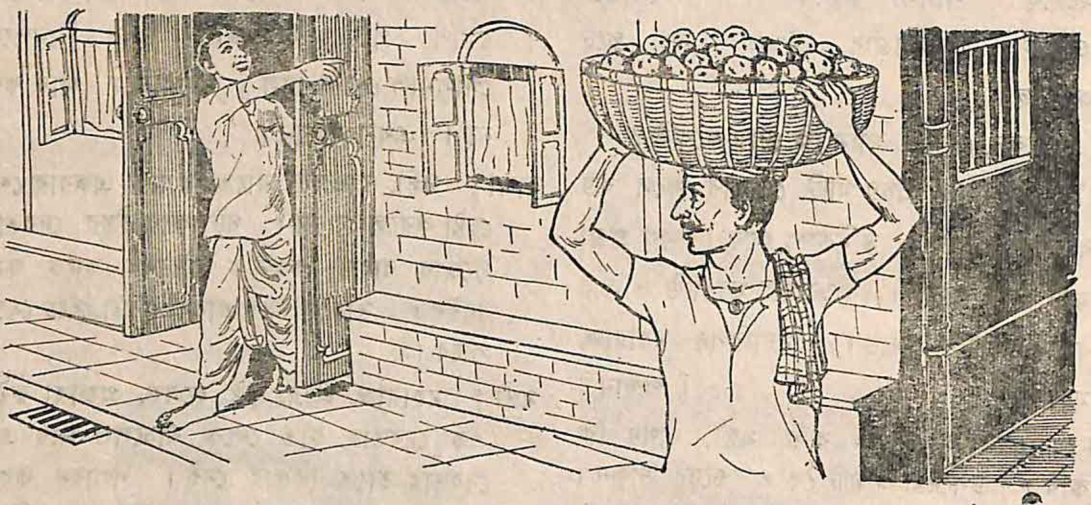
[রাণীর প্রবেশ]

রানী : চলুন মহারাজ, আমি প্রস্তুত। আমি জানতাম এমনটি হবে। তাই, আমি আগে থেকেই পলায়নের জন্য প্রস্তুত মহারাজ !

রাজা : হায় ! হায় ! গোঁফের জন্য আমি রাজ্য রাজত্ব সব হারালাম। প্রতিজ্ঞা করছি, এ জন্মে, পরজন্মে, কোন জন্মেও আর গোঁফ রাখব না। কোথায় তুমি হে গণেশবাহন, আমার গোঁফের বাকী অর্ধাংশ সাবাড় করে তুমি তুষ্ট হও দেব— তুমি তুষ্ট হও [যুক্তকর কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে রানী সহ প্রস্থান]

—শেষ—

চার খদ্দের



ঃ চরিত্র ঃ

আলুওয়ালা ॥ ভদ্রলোক ॥ পণ্ডিত ॥ পথিক ॥ বৃদ্ধ ॥ জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি

[ঝুড়ি মাথায় এক আলুওয়ালার প্রবেশ]

আলুওয়ালা ঃ [হাঁকছে] আলু রাখবেন—আলু-উ-উ-উ [বাড়ির গেট খুলে এক ভদ্রলোক রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন]

ভদ্রলোক ঃ কি হে তোমার কাছে কি ?

আলুওয়ালা ঃ আলু রাখবেন—আলু-উ-উ-উ—

ভদ্রলোক ঃ কি বললে ? আলু রাখবেন। বলি, আলু কি লোকে রাখে, না খায় ?

আলুওয়ালা ঃ আজ্ঞে খায়।

ভদ্রলোক ঃ তাহলে 'রাখবেন রাখবেন' বলে শ্লোগান দিচ্ছ কেন ?

আলুওয়ালা ঃ আজ্ঞে, আলু রেখে তবে তো খাবেন ?

ভদ্রলোক ঃ কি বললে ? রেখে খাওয়া ? মানে বাসি খাওয়া ? তুমি তো দেখছি, আমাদের খুন না করে ছাড়বে না হে।

আলুওয়ালা ঃ রাম রাম ! এ কী বলছেন কত্তা ? আমি গরীব আলুওয়ালা। ছুরি কেনার পয়সা কোথায় যে খুন করবো ?

ভদ্রলোক ঃ তুমি তো ছুরি ছাড়াই খুন করতে লেগেছ। জান বাসি খেলে কি হয় ? বাসি মানে বিষ। বাসি খেলে, পেটের অসুখ, পেট ফাঁপা, পেট ব্যথা, পেট কামড়ানো, পেট নামা, পেট ডাকা, ফুট ফাট, ভুট-ভাট, গ্যাস, এসিড, আমাশয়, কলেরা, ডাইরিয়া, কোনটা না হয় শুনি ? তার পরে কাঁচকলা সেদ্ধ খেতে খেতে

একদিন পটল তোল। ব্যাস্। তাই রেখে খাওয়ার কথা একবার বলেছ-বলেছ, দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করো না। হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হবে। যাবজ্জীবন জেল হবে।

আলুওয়ালা : [আঁৎকে ওঠে] এ্যাঁ জেল! আমি তো কিছু করিনি।

ভদ্রলোক : অনেক কিছু করেছ, অনেক কিছু করেছ। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান জান?

আলুওয়ালা : আজ্ঞে না, এর নাম তো কখনও শুনি নি! এর বাড়ি কোথায়? ঠিকেনা কি?

ভদ্রলোক : তুমি দেখছি অকাট মূর্খ! শোন, শোন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পৃথক কোন ঘর বাড়ি নেই, ঠিকেনা নেই। তার ঘর বলো, বাড়ি বলো, গ্রাম পোষ্টাফিস সব আছে পুস্তকে, মানে বই-এ। এক কথায়, যে পুস্তক পাঠ করলে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়, তাকে বলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, বুঝলে?

আলুওয়ালা : আজ্ঞে, আর কিছু না বুঝলেও এটা বুঝেছি যে আপনি আলু কিনবেন না। আমাকে মিছামিছি দেরী করালেন। ওদিকে আবার বাজার ধরতে পারব না।

ভদ্রলোক : দাঁড়াও, দাঁড়াও। কি বললে? বাজার ধরা?

আলুওয়ালা : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক : তুমি ভেবেছ আবোল তাবোল বলে আমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে? চোর ধরা, ডাকাত ধরা, মাছ ধরা, ছেলে ধরা, ধামা ধরা, হাল ধরা, ভুল ধরা, মাথা ধরা, হাত ধরা, পা ধরা, কান ধরা, গান ধরা, গলা ধরা, খিল ধরা, গোঁ ধরা, পোঁ ধরা, হাজার রকম ধরা শুনেছি, কিন্তু বাজার ধরা তো কষ্মিন কালেও শুনিনি! বলি, বাজারটাকে ধরবে কি ভাবে? বাজারটা তো জলের গ্লাস নয় যে এমনি করে [হাত দিয়ে দেখিয়ে] ধরে ফেলবে। খুব ভেবেছ, ভুলভাল বলে আমাকে বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে আলু বেচে চলে যাবে। উহুঁ বাবা, সেটি হচ্ছে না।

আলুওয়ালা : যান মশাই—

ভদ্রলোক : যাবো না তোমার কাছ থেকে অশুদ্ধ আলু কিনবো। সময়টা তোমার একার। আমার নয়! যত সব! [চলতে শুরু করলেন] শোন, যদি আলু বেচতেই হয়, তাহলে কখনও 'রাখবেন রাখবেন' করে চিল্লায়ো না। [দ্রুত প্রস্থান]

আলুওয়ালা : কি বিপদেই পড়লুম রে বাবা! এখন কি বলে হাঁকি? [একটু ভেবে নিলে] আলু খাবেন, আলু-উ-উ-উ—[জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত : এই যে আলুওয়ালা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। দেখি তোমার ঝুড়ি? উঁকি মেরে ঝুড়ির ভেতরটা দেখলেন] এ্যাঁ এযে দেখছি কতক-গুলো কাঁচা আলু!

আলুওয়ালা : আজ্ঞে, কাঁচা আলুই তো লোকে বেচে।

পণ্ডিত : বেচে তো 'খাবেন খাবেন' বলে গলাবাজি করছ কেন? তুমি কি আমাদের গোরু ছাগল ভেবেছ যে কাঁচা আলু খাব।

আলুওয়ালা : আজ্ঞে, কাঁচা আলু খাবেন কেন, রেঁধে খাবেন।

পণ্ডিত : খুব তো জ্ঞান দিচ্ছ হে। কাঁচা আলু যে রেঁধে খেতে হয়, সে কথাও তোমার কাছ থেকে

শিখতে হবে নাকি? ক'রকম আলু রাঁধতে জান হে তুমি? রাঁধতে জানেন বটে আমার গৃহিনী। এক আলুতে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধে দেবেন। আলুর দম, আলুর ঘণ্ট, আলুর পোস্ত, আলুর বড়া, আলুর ভাজা, আলুর ডালনা, আলুর চচ্চড়ি, আলুর পায়স, আলুর মালপো—কি? এই কটা শুনেই দেখছি তোমার জিভে জল টলটল করছে হে—

আলুওয়ালা : আচ্ছা পাল্লায় পড়েছি তো! আজ্ঞে আপনি আলু কিনবেন নাকি বলুন—

পণ্ডিত : ও, আলু কিনতে হবে! তা সে কথা আগে বললেই পারতে? আলু 'খাবেন খাবেন' বলে ষাঁড়ের মত চেচাচ্ছিলে কেন?

আলুওয়ালা : আমার ঘাট হয়েছে মশাই। এখন বলুন আলু নেবেন কিনা? বাজারের সময় চলে যাচ্ছে।

পণ্ডিত : কি বললে? সময় চলে যাচ্ছে! সময়ের কি হাত-পা গজিয়েছে যে সে চলতে পারবে? মানুষ চলে, গরু চলে, ঘোড়া চলে, পোকা-মাকড় চলে, কীট-পতঙ্গ চলে, জন্তু জানোয়ার চলে—ওদের ঠ্যাং আছে। পাখী চলে, বিমান চলে,—ওদের পাখা আছে। সময়ের কটা ঠ্যাং? কটা পাখা? কটা চাকা? কি, হাঁ করে আছ কেন এখন? জানবে না, শুনবে না একটা বলে দিলেই হলো।

বলি, ব্যাকরণ পড়েছ? [উচ্চারণ করবেন বিয়াকরণ]

আলুওয়ালা : আজ্ঞে কি করণ বললেন?

পণ্ডিত : বিয়াকরণ—

আলুওয়ালা : ওটা অনেক আগেই করে ফেলেছি।

পণ্ডিত : করে ফেলেছ, বিয়াকরণ করে ফেলেছ? খুব করেছ। পথ দেখো, পথ দেখো বলছি [ক্রুদ্ধ হলেন]

আলুওয়ালা : আপনি হঠাৎ এমন তেলে-বেগুন হলেন কেন কত্তা? আমি এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ করলুম?

পণ্ডিত : মহাভারত বিশুদ্ধও কর নি। কতগুলো বদ্ধ কাঁচা আলু বয়ে এনে 'খাবেন খাবেন' বলে মানুষকে লোভ দেখাচ্ছো! জোচ্চুরির আর জায়গা পেলে না। বেঁচে গেলে এ যাত্রা, পুলিশ ডাকলুম না। মনে থাকে যেন। [বলতে বলতে হন্ হন্ করে প্রস্থান]

[আলুওয়ালা হতভম্ব। এই শীতের সকালেও কপাল থেকে দর দর ঘাম ঝরতে লাগল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে—]

আলুওয়ালা : না জানি কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে উঠেছিলুম! যাই ওদিকটায়। আলু না বেচলে খাব কি? এখন কি বলেই বা হাঁক দিই! [কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে] খাবার আল রাখবেন—খাবার আলু উ-উ-উ—[এক কংকাল সার বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ : কি বলছ হে—খাবার আলু! এটা কি বস্তু? কত আলু শুনলুম, কিন্তু খাবার আলু তো শুনি নি কখনো। গোল আলু, রাঙ্গা আলু, মিষ্টি আলু, শাকালু, খামালু, শকরকন্দ আলু নৈনিতাল আলু, শিলং আলু, ভোলাগঞ্জ আলু, জোলাইবাড়ি আলু—

[এক পথিক শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল]

পথিক : কি দাদু, আলোর ফিরিস্তি দিচ্ছেন যেন। আপনি আর ক'টা আলোর

নাম জানেন। শুনুন তাহলে, সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, গ্রহের আলো, নক্ষত্রের আলো, প্রদীপের আলো, বিদ্যুতের আলো, লণ্ঠনের আলো, আলেয়ার আলো, জ্ঞানের আলো, দিনের আলো, রাতের আলো—কত শুনবেন? এক্ষুনি আলোয় আলোময় করে দিতে পারি।

বৃদ্ধ : তুমি কে বট হে। কথা হচ্ছিল আমার আর আলুওয়ালার মধ্যে। তুমি হঠাৎ নদীতে ভেসে যাওয়া কাঠের গুঁড়ির মত উঁকি মারলে কেন? এ তোমার অনধিকার প্রবেশ।

পথিক : মোটেই নয়। আলোর রাজ্যে সকলের সমান অধিকার। সূর্যের আলো সকলে সমান ভাবেই পাই কিনা বলুন দিকি?

বৃদ্ধ : জানা আছে, জানা আছে। সূর্যের আলো কিনতে তো আর পয়সা লাগে না, যদি লাগতো তো দেখতাম, কতটা সমানভাবে পাই। কিন্তু কথা হচ্ছিল আলু নিয়ে আর তুমি উটকো এসে আলো জ্বালতে শুরু করে দিলে? 'উ' 'ও'র তফাৎ জান না, নাক গলাতে এসেছ। বাল্যশিক্ষার প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়ে এসো গে, যাও—

পথিক : কি বললেন মশাই, আমার কি বাল্যকাল যে বাল্যশিক্ষা পড়ব? পথেঘাটে ভদ্দরলোককে অপমান করবেন না বলে দিচ্ছি। [জোর তর্ক লেগে গেল। সুযোগ বুঝে আলুওয়ালা সটকে পড়ল]

বৃদ্ধ : অপমান তো এখনও কিছু করিইনি। আর যদি বাড়াবাড়ি কর, তাহলে যাচ্ছেতাই অপমান করব।

পথিক : কি বললেন? ডাকবো নাকি আমার কেশরী ভাইকে?

বৃদ্ধ : কেশরী ভাই?

পথিক : হ্যাঁ সিংহের কেশরের মত তার কেশরাজি। পাড়া-বেপাড়ার লোক কেশরী ভাইয়ের দৌরাত্মে থরহরি কম্পিত। এর নাম শুনেই অনেকের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ডাকবো নাকি?

বৃদ্ধ : দোহাই আপনার আমি হার্টের রোগী। ওরকম কেশর দেখলে, আমি এমনিতে ভয়ে চোখ বুজে পথ চলি। দয়া করে ওই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করবেন না। দেখুন, আমার কোন দোষ নেই। এই আলুওয়ালাই যত নষ্টের গোড়া নারদঠাকুর। এ্যাঁ, ব্যাটা গেল কৈ? দেখলেন তো আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে কেমন গুটি গুটি সটকে পড়েছে। ব্যাটা নির্ঘাত পলিটিসিয়ান। কিছু মনে নেবেন না মশাই, চলুন তো দেখি ওই চায়ের দোকানটায় ঢুকে দু' পেয়ালা চা মেরে দিই দুজনে। পয়সাটা আমিই দেব।

পথিক : না, না, চা কেন? চা কেন?

বৃদ্ধ : এজন্যেই। চলুন তো দেখি—[টেনে নিয়ে প্রস্থান]

[আলুওয়ালার প্রবেশ। হাঁফাতে হাঁফাতে বসে পড়ল]

আলুওয়ালা : না আজ আর আলুর গতি হচ্ছে না, আমারও গতি হচ্ছে না। দেখি, একবার শেষ চেষ্টা করে। এবার আর বাড়তি কিছু বলব না। [উঠে দাঁড়াল ও হেঁকে পথ চলতে লাগল] আলু— আলু-উ উ-উ—

[জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রবেশ]

ব্যক্তি : কি হে, 'আলু আলু' করে ডাকতে লেগেছ কেন ? আলু হারিয়েছে ? না চুরি গেছে ?

আলুওয়ালা : আজ্ঞে, ঠিক তা নয়।

ব্যক্তি : তা নয় যদি তাহলে 'আলু আলু' করে আলুখোঁজা খোঁজছ কেন ? কিছু হারালেই তো লোকে এরকম ডাকাডাকি সুরু করে। বাচ্চা ছেলে হারালে 'খোকা খোকা' করে লোকে গলা ফাটায়, গোরু হারালে 'হাম্বা হাম্বা' করে ডাক ছাড়ে, কুত্তা হারালে আয় তুতু, আয় তুতু করে হাঁক দেয়, বেড়াল হারালে 'পুষি পুষি' করে চেল্লায়, হাঁস হারালে আয় চৈ চৈ আয় চৈ চৈ করে আদুরে ডাক দেয়। তাই আলু হারালে 'আলু আল' করে হাঁকবে এটা কোন দোষের নয়।

আলুওয়ালা : কি যে বলছেন আপনি ?

ব্যক্তি : ঠিকই বলছি হে, ঠিকই বলছি। তুমি বোধ করি, হারাধন খুঁজতে খুঁজতে থানায় চলেছ ? যেয়ো না যেয়ো না। শোন তাহলে, একবার আমার আদরের দুধেল ছাগলটা চুরি যায়। গেলাম থানায় রিপোর্ট করতে। রিপোর্ট করতেই সুরু হল জেরা। সে কি জেরা। ছাগলের দৈর্ঘ কত, প্রস্থ কত, উচ্চতা, বেধ কত, রং কি ? —বললাম কালো। প্রশ্ন হলো, কি রকম কালো ? মিশমিশে, কুচকুচে না চিকচিকে ? তারপর প্রশ্ন, ছাগলটির চোখ ক'টি ছিল, কান ক'টি, লেজ ক'টি, দাঁড়ি গজিয়েছিল কিনা, গজিয়ে থাকলে দৈর্ঘ কত, সংখ্যাই বা কত, এবং ছাগলটির দাঁড়িতে পা বুলানোর অভ্যেস ছিল কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি ডজন দশেক প্রশ্ন, সব আর এখন মনে নেই। কিন্তু ভায়া, ঐখানেই শেষ নয়। তারপর থেকে সুরু হলো, হপ্তায় এক দু'বার থানায় হাজিরা দেওয়া।

আলুওয়ালা : ওকি কথা। চুরি গেল ছাগল, আর আপনি দিতে লাগলেন হাজিরা ?

ব্যক্তি : মানে, থানাতে চোরাই ছাগলের আবির্ভাব হলেই, ডাক পড়ে আমার ছাগল সনাক্ত করতে। কত ছাগল দেখলাম, বলতে পার ছাগলের একটা পাহাড়, কিন্তু কোথায় আমার কালোসোনা। মাঝের থেকে বাসভাড়া রিক্সাভাড়ার দশ ছাগলের দাম পকেট ছাড়া হয়ে গেল। শেষটায় এই হাজিরার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য একদিন বলে দিলুম, আমার হারানিধি ফিরে পেয়েছি। অর্থাৎ ঘরের ছাগল ঘরে ফিরেছে। থানাওয়ালা খুশিতে মুচকি হেসে বললেন, গোয়েন্দাগিরির ঠেলার চোটে ছাগল মহাশয়ার আর আত্মগোপন করে থাকার উপায় ছিল না যে।' বুঝলে ভায়া, তাই বলছিলুম, আলুর খোজ না পেলে সোজা বাড়ি চলে যাও, থানা মুখো হয়ো না।

আলুওয়ালা : কি বলছেন মশাই, আমার আলু হারানো যায় নি, চুরিও হয় নি।

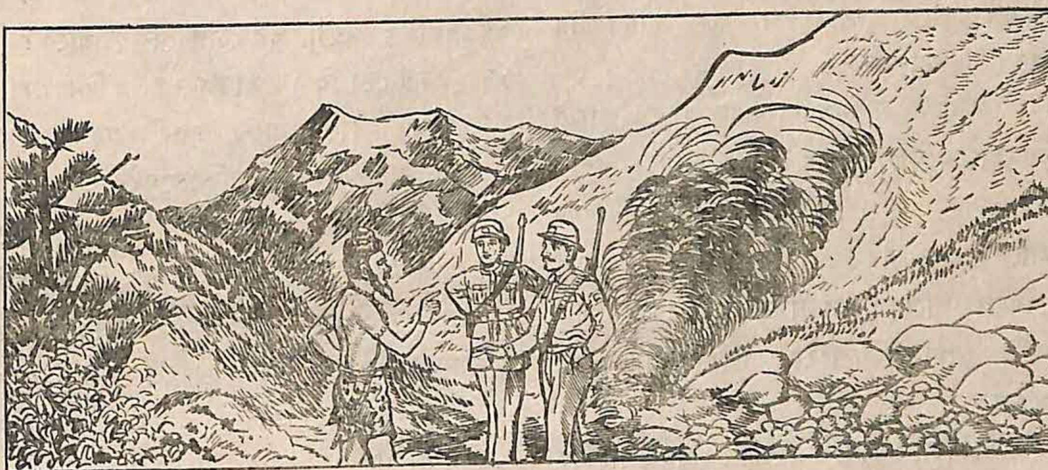
ব্যক্তি : তাহলে কি 'আলু আলু' করে আলুর নাম জপ করছিলে। খামাকা আমাকে এতটা বকালে কেন। যতসব গবাকান্তে দেশটা ছেয়ে গেছে। দেখি পথ ছাড়, আমি যাই, যত সব গবাকান্ত [রেগে মেগে প্রস্থান]

আলুওয়ালা : দেখলে, কি কথা থেকে কি বানিয়ে উল্টে আমাকেই চোখ রাঙানি। এই আলুর জন্যেই আমার আজ এত হেনস্থা। এই আলুই আমার শত্রু। কথায় বলে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। [আলুওয়ালা ঝুড়িশুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দিল] প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর আলু স্পর্শ করব না—করব না—করব না।

[বলতে বলতে প্রস্থান]

—শেষ—

বিদ্যারাম রাজা, বুদ্ধিরাম মন্ত্রী



চরিত্র

রাজা ॥ মন্ত্রী ॥ সভাসদ ॥ গাজন চন্দ্র ॥ দুই সেপাই ॥ সাধু ॥ সাক্ষী

[বিদ্যারাম রাজার রাজ সভা। বুদ্ধিরাম মন্ত্রী পার্শ্বে উপবিষ্ট। সভাসদেরা আসন অলংকৃত করেছেন। এমন সময় জনৈক প্রজার প্রবেশ। প্রজার নাম গাজন চন্দ্র]

গাজন চন্দ্র : মহারাজ, নালিশ আছে।

রাজা : কি নালিশ ?

গাজন : চুরির নালিশ।

রাজা : কি চুরি ?

গাজন : ঘর চুরি। কাল রাতে চোর আমার ঘরটি হাতিয়ে নিয়েছে।

রাজা : এ্যাঁ ঘর চুরি! মানে সব চাইতে বড় চুরি! আমার রাজ্যে ?

গাজন : আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, আমি আপনার রাজ্যের এক গরীব প্রজা।

মন্ত্রী : গরীবের ঘর চুরি—অমার্জনীয় অপরাধ।

রাজা : থালা বাসন চুরি হয় মানি। সোনাদানা চুরি হয় জানি। টাকা পয়সা চুরি হয় শুনি। বড় রকম চুরির মধ্যে পুকুর চুরির নজীরও আছে। তাই বলে ঘর চুরি ?

গাজন : মহারাজ, কাল রাতে জলজ্যান্ত ঘরটির ভেতর শুয়েছি। সকালে উঠে দেখি আমি আছি, ঘরটি নেই। বিচার করুন মহারাজ :

রাজা : অত উতলা হয়ো না। চোর ধরা পড়লে মাল মিলবে। [মন্ত্রীকে] মন্ত্রী, আমাদের আইনের বইয়ে ঘরচোরের শাস্তি কি লেখা আছে ?

মন্ত্রী : সোনার মেডেল।

রাজা : সোনার মেডেল ? ন্যায় বিচার হবে তো মন্ত্রী ?

মন্ত্রী : আলবাৎ হবে। সেরা খেলোয়ার মেডেল

পায়, সেরা গাইয়ে মেডেল পায়, সেরা বাজিয়ে মেডেল পায়। ঘর চোর—সেরা চোর। 'সেরা' হিসেবে তাকে মেডেল না দিলে ন্যায় বিচার হবে কেন মহারাজ ?

রাজা : না মন্ত্রী, আমি ন্যায় বিচার করব। আজই ঘর চোরের জন্য সোনার মেডেল বানাতে দিন।

জনৈক সভাসদ : মহারাজ আমার একটা নিবেদন আছে। ঘরচোর সোনার মেডেল পেলে শেষটায়, রাজ্যের ঘর বাড়িগুলো থাকবে তো ? নাকি, আমাদের সবাইকে গাছতলা সার করতে হবে ?

রাজা : তাইতো, শেষে যদি রাজপ্রসাদটাই লোপাট হয়ে যায় ? চোরের শাস্তির কোন বিধান কি আইনের বইয়ে নেই মন্ত্রী ?

মন্ত্রী : চোরের শাস্তির বিধান আছে মহারাজ। সেরা চোরের শাস্তির বিধান নেই।

রাজা : নতুন বিধান করুন। রাজপ্রসাদটাকে বাঁচাতে হবে যে !

মন্ত্রী : তাহলে, সোনার মেডেল গলায় ঝুলিয়ে ঘরচোরকে শূলে চড়ান। শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অপরাধের শাস্তি-দুই-ই হবে।

রাজা : বাহবা ! খাসা। বুদ্ধিরামের বুদ্ধির জয় হোক। তাই হবে ঢোল পিটিয়ে দিন। আর গোয়েন্দা প্রধানকে ডাকুন। সাতদিনের মধ্যে ঘরচোরের গ্রেপ্তার চাই। সোনার মেডেল বানাতে দিন। শূল টাকেও ঘষামাজা করুন।

[সভার কাজ শেষ হলো]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[ছোট্ট পাহাড়। পাহাড়ী পথে দুই গোয়েন্দা-সেপাই]

১ম সেপাই : না, ঘরচোর দেখছি, আমাদের চাকরীটা খাবে ?

২য় সেপাই : এঁ্যা, ঘর চোরা চাকরী খাবে ?

১ম : নয় তো কি। সাতদিনের ছ'দিন তো চলে গেছে। হাতে বাকী একটি দিন। ঘরচোর ঘর নিয়ে কোনখানে লুকিয়েছে কে জানে।

২য় : কি করব বল। পথঘাট, বাজার হাট, অলিগলি চষে ফেলেছি। বাকী এই পাহাড়টা। কত ব্যাটাকে জিগ্যেস করলুম, রাতের অন্ধকারে ঘর নিয়ে কাউকে যেতে দেখেছে কিনা। একটা প্রাণী হাঁ বললে না। সব ব্যাটা মিথ্যা-বাদী।

১ম : মিথ্যাবাদী নয়, মিথ্যাবাদী নয়। আসলে জানলেও বলবে জানি না। দেখলেও বলবে দেখি নি। শেষে যদি সাক্ষ্য দিতে হয়। এই ভয়।

২য় : যা আছে কপালে। চল যাই এগিয়ে।

১ম : [থমকে দাঁড়িয়ে অদূরে কি লক্ষ্য করল] এই, দেখছিস ?

২য় : কি ?

১ম : পাহাড়ের নীচে আগুন লেগেছে।

২য় : এঁ্যা আগুন লেগেছে ? [চিৎকার] আগুন ? আগুন ? কৈ-রে কোথায় আগুন ? এতো দেখছি ধোঁয়া।

১ম : আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় ? নিশ্চয়ই মাটির নীচে আগুন। চল দেখি তো, ব্যাপারটা কি ? [অগ্রসর]

[দুজনে ধোঁয়ার কাছে পৌঁছল। পাহাড়ের গুহা থেকে চুল দাড়িওয়ালা এক সাধুর আবির্ভাব]

২য় : এঁ্যা সাধু বাবা ! প্রণাম কর, প্রণাম কর !

১ম ঃ রাখ্। না বুঝেসুঝে হুট করে পায়ে হাত দিস্ নে। গোয়েন্দার দৃষ্টিতে চেয়ে ছাখ। ঘরচোরের মত লাগছে না ?

২য় ঃ ধ্যেৎ, পাপ হবে। ইনি সাধু মহাপুরুষ।

১ম ঃ বোকা। জানিস, সেরা চোররা দেখতে সাধুর মত হয়। গোয়েন্দার দৃষ্টিতে চেয়ে ছাখ। [সাধুকে] বাবাজীর নিবাস ?

সাধু ঃ তোমরা কে ? কি চাও ?

১ম ঃ আমরা রাজার লোক। জানতে চাই আপনার নিবাস ?

সাধু ঃ ঐ যে ধোঁয়া উঠছে ওখানে।

২য় ঃ ঐ ধোঁয়া বুঝি আপনার ধুনি থেকে বেরুচ্ছে ?

১ম ঃ বোকা। গোয়েন্দার মত প্রশ্ন করতে হবে। চলুন, আপনার নিবাস সরজমিনে তদন্ত করব। [অগ্রসর হয়ে গুহার কাছে গেল]

১ম ঃ এতো দেখছি, একটা গর্ত।

সাধু ঃ এ গর্ত নয়, গুহা। এ গুহাতে আমি থাকি।

১ম ঃ এই গর্ত কে খুঁড়েছে ?

সাধু ঃ বলছি গর্ত নয়, গুহা।

১ম ঃ ফাঁকি দিতে পারবে না। গর্তকে গুহা বলে চালাতে চাও। নিশ্চয়ই তোমার বদ মতলব আছে।

২য় ঃ আহা, সাধু যখন বলছেন গুহা—

১ম ঃ থাম্ তো। গোয়েন্দার দৃষ্টিতে ছাখ। দেখতে পারি, এটা গুহা নয়—খাঁটি গর্ত ; [সাধুকে] এই কাজে কদ্দিন হাত পাকিয়েছেন ?

সাধু ঃ কি আজেবাজে বকছো তুমি ?

১ম ঃ আজেবাজে। উহুঁ বাবাজী, এ গোয়েন্দার চোখ। ফাঁকি দিতে পারবে না। ঘর চুরিতে হাত পাকিয়ে এখন পাহাড় চুরিতে লেগেছ ? কদ্দুর ? কদ্দুর সিঁদ কেটেছো কে জানে !

২য় ঃ সিঁদ কেটেছে ? কোথায় ?

১ম ঃ বোকা, বুঝিস নি ব্যাপারটা ? তোর ওই বাবাজী, পাহাড়টা মেরে দেবার মতলবে ছিল।

সাধু ঃ মানে ?

১ম ঃ মানে, ভালোছেলের মত বলে ফেল দেখি চুরি করে ঘরটা কোথায় রেখেছ ?

সাধু ঃ ঘর চুরি ? কার ? কে চুরি করেছে ?

১ম ঃ যে পাহাড়টা চুরি করতে বসেছে, সে-ই করেছে। চলো রাজার কাছে, সোনার মেডেল পাবে। হাঃ হাঃ হাঃ

[সাধুকে নিয়ে উভয়ের প্রস্থান]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

রাজসভা। বন্দী সাধুকে নিয়ে দুই গোয়েন্দা সিপাইর প্রবেশ]

রাজা ঃ কাকে গ্রেপ্তার করে এনেছ হে ?

১ম ঃ ঘরচোরকে।

২য় ঃ মহারাজ, এ ছদ্মবেশি সাধু, আসলে ঘরচোর। এমন কি পাহাড় চোরও বটে।

রাজা ঃ পাহাড় চুরি ?

১ম ঃ আজ্ঞে হাঁ মহারাজ আর একটু বাদে যদি পৌঁছতাম, তাহলে হয়ত গোটা পাহাড়টা লোপাট হয়ে যেত। সিঁদ কেটে কেটে পাহাড়টাকে মেরে দেবার মতলব করছিলেন বাবাজী।

রাজা : গুরুতর অপরাধ। মন্ত্রী। পাহাড়চুরির শাস্তি কি ?

মন্ত্রী : মহারাজ, এক্ষণে বুঝতে পারছি। ওই উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো কেন দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে। সিঁদকেটে চোর বাবাজী পাহাড়গুলোর এই হাল করেছে।

রাজা : কি শাস্তি দেব মন্ত্রী ?

মন্ত্রী : মহারাজ, নালিশ ছিল ঘরচুরির। শাস্তি দেবেন পাহাড়চুরির—এ হয় না। আগে ঘর-চুরির বিচার হোক।

সাধু : মহারাজ, আমি ঘরচুরি করি নি।

রাজা : ধোঁকা চলবে না। সোনার মেডেল গলায় পরে শূলে চড়তে তৈরী হও।

সাধু : এ্যা-শূল ! [ভয়ে কাঁপতে লাগল] মহারাজ আমার একটা নিবেদন আছে।

রাজা : নির্ভয়ে বল।

সাধু : মহারাজ, চোরের কর্তব্য চুরি করা। আমি যদি ঘর চোর তবে আমার কর্তব্য আমি করেছি। কিন্তু, কোতোয়ালের কর্তব্য পাহারা দেওয়া] কোতোয়াল যদি তার কর্তব্য করতো, তবে ঘর চুরি হতো না। অতএব এই ঘর চুরির জন্য কোতোয়ালই দায়ী।

রাজা : মন্ত্রী—

মন্ত্রী : হাঁ মহারাজ। নীতি শাস্ত্র অনুযায়ী সাধু ঠিকই বলেছে। দেখা যাচ্ছে, কোতোয়ালই ঘরচুরির জন্য দায়ী।

রাজা : তবে যাও সাধু, তুমি মুক্ত। কে আছিস কোতোয়ালকে শূলে চড়া।

[কোতোয়াল হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠল]

কোতোয়াল : মহারাজ আমি ঘরচোর নই। আমার কর্তব্য আমি ঠিক ঠিক পালন করেছি। গাজন চন্দ্রের প্রতিবেশীরা আমার সাক্ষী।

রাজা : ডাকো সাক্ষীকে।

[সাক্ষীর প্রবেশ]

সাক্ষী : মহারাজের জয় হোক।

রাজা : সাক্ষী, সত্য বল, কোতোয়াল রাতে পাহারা দিয়েছিল ?

সাক্ষী : রাতভর পাহারা দিয়েছে মহারাজ।

রাজা : তাহলে গাজনচন্দ্রের ঘর চুরি হল কিভাবে ?

সাক্ষী : গাজনচন্দ্রের ঘর যথাস্থানেই আছে মহারাজ।

রাজা : মন্ত্রী, সাক্ষী বলছে কি ?

মন্ত্রী : মহারাজ, বিষয়টি গুরুতর। সরজমিনে তদন্ত করতে হবে।

রাজা : তাহলে আপনি নিজে স্বচক্ষে তদন্ত করুন মন্ত্রী।

মন্ত্রী : যথা আদেশ মহারাজ। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। কৈ হে সাক্ষী চলতো—

[সকলের প্রস্থান]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

[রাজসভা। রাজা, মন্ত্রী, কোতোয়াল, গাজন চন্দ্র ও সভাসদগণ]

মন্ত্রী : মহারাজ, গাজনচন্দ্র মিথ্যাবাদী। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি গাজনচন্দ্রের ঘর বহাল তবিয়তে আছে।

রাজা : [ক্রুদ্ধ] গাজনচন্দ্র, তুমি মিথ্যুক। মিথ্যা বলার অপরাধে তোমার শাস্তি পেতে হবে। কঠোর শাস্তি।

গাজন : মহারাজ, এই মিথ্যা বলার জন্য আমি দায়ী নই।

রাজা : ফাঁকি দিয়ে বাঁচতে চাইছ ?

গাজন : তিন সত্যি মহারাজ। এই মিথ্যা বলার জন্য আমিই মোটেই দায়ী নই।

রাজা : কে দায়ী ?

গাজন : গাঁজা।

রাজা : গাঁজা !

গাজন : আজ্ঞে হাঁ মহারাজ। রাতে শোবার আগে দমের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বেশি হয়েছিল। সকালেও ঘোর কাটেনি। দেখি কি, ঘরটা জায়গায় নেই। কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। তাই বলছি মহারাজ, মিথ্যাবলার দোষটা আমার নয়।

রাজা : সাক্ষী আছে ?

গাজন : আছে মহারাজ। [পকেট থেকে গাঁজার কল্কে বের করে] এই কল্কে সাক্ষী আছে মহারাজ।

রাজা : মন্ত্রী, এই সাক্ষী কি বিশ্বাস যোগ্য ?

মন্ত্রী : মহারাজ, সাক্ষী নিজে যখন গাজন চন্দ্রের পকেট থেকে বেরিয়েছে, তখন গাজনের কথা ঠিক।

রাজা : তাহলে ঘরচুরির জন্য কে দায়ী।

মন্ত্রী : সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যাচ্ছে, গাঁজাই ঘর চুরির জন্য দায়ী।

রাজা : তাহলে, আমি গাঁজার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলুম। গাঁজাকে শূলে চড়াও। আর গাজন তুমি মুক্ত।

সভাসদগণ : জয় ন্যায় বিচারক মহারাজ বিদ্যা-রামের জয় !

—শেষ—